অন্দর মহল

শচীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশনে
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ ঃ   ফাল্গুন ১৩৬৬

কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ
রণেন অয়ন দত্ত

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

ব্লক মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিণ্টার্স

বাঁধাই
শ্রীকৃষ্ণ বুক বাইণ্ডিং

দাম ঃ   তিন টাকা

উৎসর্গ

রমাপদ চৌধুরী

প্রিয়বরেষু

এই লেখকের ঃ

অন্য নগর
এই মর্ত্যভূমি
দূরের মিছিল
মুখর লণ্ডন
ইভনিং ইন প্যারিস
নতুন বাসর
ব্যালেরিনা
তুর্গতোরণ
অন্তঃপুর
সুধাসঙ্কেত
প্রদক্ষিণ
নীলকণ্ঠী
স্মরণচিহ্ন

সূচীপত্র

॥ অকৃত্রিম ॥

ঠিকানা দেবার সময় মিসেস চ্যাটার্জি হালকা হেসে নন্দিতাকে বলেছিলেন, খুব বড়লোক। ব্যাচেলার। তুমি গেলে মোটা টাকা চাঁদা দেবেন নিশ্চয়ই। তবে একা যেয়ো না। অনেক দোষ আছে শুনেছি।

নন্দিতা জিজ্ঞেস করেছিল, কি দোষ?

ষাট বছরের ব্যাচেলারের যা দোষ হয় তাই।

হাসির আওয়াজ তুলেছিল নন্দিতা, ষাট বছরের বুড়োর কাছে আমাকে একা যেতে বারণ করছেন?

নন্দিতার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে খসখস করে একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে দিয়ে মিসেস চ্যাটার্জি বলেছিলেন, এই নাও।

চেনা নাম। লোকেন গুপ্ত। জাহাজের কারবারী। রাস্তাটাও নন্দিতার জানা। একুশ নম্বর গ্রোভ অ্যাভিনিউ। টেলিফোন আছে নিশ্চয়ই। প্রসাধনের ছোপ লাগা সরু লম্বা আঙুলে নন্দিতা ডিরেক্টারির পাতা ওল্টায়।

উনিই ধরেছিলেন। ভারী গলার স্বর। নন্দিতার কথা শুনে হেসে ওঠেন। উৎসাহের একটা স্পষ্ট আভাস তারের মধ্যে দিয়েই যেন নন্দিতার কানে এসে পৌঁছয়। লোকেন গুপ্ত হালকা স্বরে জানতে চান সাউথ ক্যালকাটা উইমেনস ক্লাবের অনুষ্ঠানে তাঁকে কি প্রয়োজন। উত্তরে নন্দিতাও কি একটা বলে—এখন ঠিক মনে পড়ে না। রবিবার দিন সকাল নটা থেকে সাড়ে নটার মধ্যে তাকে যেতে হবে সেখানে।

প্রসাধনের তুলি বুলোতে সময় লেগেছে নন্দিতার। হয়তো কোনও

প্রয়োজন ছিল না। একজন বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াবার পক্ষে তার বয়সটাই তো সব চেয়ে বড় প্রসাধন। ঠিক লোকেন গুপ্তর জন্যে নয়, অভ্যাসের জন্যেই স্বাভাবিক চেহারাটা ঘষে-মেজে অস্বাভাবিক করতে হল নন্দিতাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়েই একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামায় নন্দিতা। ড্রাইভারকে বলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এ নিয়ে যেতে। তার হাতে নীল একটা ব্যাগ আর সাদা সোনালী রঙের পাতলা একটা বই আর কয়েকটা কাগজ।

ছোট ঘড়িটা চোখ নামিয়ে দেখে নন্দিতা। মিনিট দশেক দেরি হয়েছে। ওর ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে যায়। ভাড়া চুকিয়ে হিল তোলা জুতো ঠেকায় ছোট ছোট পাথর কুচির ওপর। গেট থেকে লম্বা রাস্তা চলে গেছে লোকেন গুপ্তর বাড়ি অবধি। নেপালী দারোয়ান সঙ্গে করে নিয়ে যায় নন্দিতাকে।

কেমন এক কৌতূহল কাঁপে তার চোখে। সামনে বিশাল এক অট্টালিকা। এপাশে ওপাশে তালের সারি। গ্যারেজে দু-তিনটে মোটর। বাগানে রঙ-বেরঙের ফুল। দারোয়ানের সঙ্গে হিলের খট-খট শব্দ তুলে মার্বেলের সিঁড়ি বেয়ে নন্দিতা ওপরে উঠে যায়।

অল্প-অল্প রোদে সাদা লম্বা বারান্দা চকমক করে। পুরু নীল বেতের চেয়ার সাজিয়ে রাখা হয়েছে একদিকে। দূরে সবুজ বনের শোভা। শহরতলীর আশ্চর্য নির্জনতা। গদি-ঠাসা বেতের চেয়ারে বসে বসে নন্দিতা দেখে। শোভা আর সম্পদ। দেখে আর ভাবে, এ সবের মালিক বৃদ্ধ—অবিবাহিত। তখন মনে মনে সে হাসে।

বারান্দার একেবারে অন্য প্রান্তে একটা ঘর। হাওয়ায় নীল রঙের ভারী পর্দা কাঁপছে। নিঝুম চারপাশ। একটাও লোক নেই। এতটুকু কোলাহল নেই। একটা ছেলে একটা মেয়ে, আত্মীয় কি আত্মীয়া কেউ নেই কোথাও। এই ভয়াবহ নির্জনতায় একটু একটু বুক কাঁপে

নন্দিতার। একটা ছেলেমানুষী ভয়। এখান থেকে ভালয় ভালয় ফিরে যেতে পারলে হয়। মিসেস চ্যাটার্জির কথাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে যায়।

সেই নীল পর্দাটা সরে যায়। ঝকঝকে একটা মুখ। ঘাড় ফিরিয়ে কাকে কি বলছেন। ঠিক টেলিফোনের মত গলা। স্বর শুনেই নন্দিতা লোকেন গুপ্তকে চিনতে পারে। হাতের কাগজ-পত্র সে ঠিক করে নেয়। টেবিলের উপর রাখা ব্যাগটা নিজের কাছে সরিয়ে আনে।

জুতোর খটখট আওয়াজ। হাসিমুখে লোকেন গুপ্ত এগিয়ে আসেন নন্দিতার দিকে—বারান্দার এ-প্রান্তে। তখন সূর্যের আলো পুকুরের জলে ঝিলমিল করছে। আর পুরনো অশ্বত্থ গাছে একটা ছোট রঙিন পাখি কিচির মিচির শব্দ তুলে লাফালাফি করছে এ-ডাল থেকে ও-ডালে।

নন্দিতা উঠে দাঁড়িয়ে বলে, গুড মর্নিং।

মর্নিং। বসুন। নন্দিতার বসবার অপেক্ষায় লোকেন গুপ্ত দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। একটা সিগারেট বের করে কেসের উপর টুকটুক শব্দ করেন। তারপর ফস করে দেশলাই জ্বালান। এলোমেলো পাতলা ধোঁয়া নন্দিতার কানের পাশ দিয়ে সরে সরে যায়। একটা মিষ্টি গন্ধ—মধুর একটা ঝাঁজ। দু-এক মিনিট চুপচাপ। লোকেন গুপ্ত দেখেন নন্দিতাকে।

দেখবেনই। তার রূপ। তার প্রসাধন। সব ছাড়িয়ে তার বয়স। একথা সে বুঝতে পারে বলেই একটু বেশিক্ষণ দেখতে দেয়। কিন্তু নন্দিতাও দেখে লোকেন গুপ্তকে। মাথার কালো চুল। মুক্তোর সারির মতো সাদা ঝকঝকে দাঁত। গালের চামড়া টান-টান। ঐশ্বর্যের কড়া গন্ধ যেন বেরিয়ে আসছে শরীর থেকে। দামী স্যুট। দামী জুতো। গলায় বাদামী রঙের টাই। সম্পদের বিপুল শক্তি বয়সের ভার দূরে ঠেলে রেখেছে। দেখতে দেখতে নন্দিতা কথা আরম্ভ করবার ভাষা পায় না।

আপনিই টেলিফোন করেছিলেন? মুখে অল্প হাসি লোকেন গুপ্তর, বলুন কি করতে পারি?

তৎপর হয়ে ওঠে নন্দিতা, আমাদের ক্লাবের কথা আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন?

ও ইয়েস। শিগগিরই একটা শো হচ্ছে তো আপনাদের?

সেই ব্যাপারটার জন্যে আপনার কাছে আসা, সাদা সোনালী রঙের বইটা লোকেন গুপ্তর দিকে এগিয়ে দিয়ে নন্দিতা বলে, আমাদের পেট্রন হতে হবে আপনাকে—

হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত, উইমেনস্ ক্লাবে ব্যাচেলার পেট্রন? গুড আইডিয়া! কিন্তু যদি আপত্তি করে কেউ?

মৃদু হেসে নন্দিতা বলে, আমিই একজন সেক্রেটারি।

ভেরি গুড, নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন লোকেন গুপ্ত, কিন্তু কাজটা হবে কি আমার?

এই বইতেই আপনি সব পাবেন, হাসির ঝিলিক তুলে নন্দিতা বলে, ইচ্ছে মত ডোনেশন যখন হয় দেবেন—ইউ আর দি ওনলি ব্যাচেলার পেট্রন মিস্টার গুপ্ত।

ছাটস ফাইন।

বোধহয় একটু জোরেই হেসে ফেলেছিল নন্দিতা। দূরের ভারী পর্দাটা আবার নড়ে ওঠে। সরে যায়। তরল বিদ্যুতের মত নন্দিতার কৌতূহলী দৃষ্টি ছিটকে যায় সেদিকে।

আর একটা মুখ। শিথিল নিষ্প্রভ। কপালে গভীর রেখার ভিড়। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সাধারণ সাদা শাড়ি। চোখের চশমাটা সব চেয়ে বেমানান। হাতে সাদা একটা ব্যাগ। দূর থেকে উষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় নন্দিতার দিকে। বারান্দার কোণ ঘেঁষে এগিয়ে আসে।

হয়তো দুস্থ কোন আত্মীয়া। বাড়ির চাকর-বাকরদের চালায়। কিম্বা সংসারের সব কাজ করে। বড় লোকের অমন কেউ না কেউ তো থাকেই। কিন্তু ওর দৃষ্টি নন্দিতার শরীরে কাঁটা ফোটায়।

ভদ্রতার সব আবরণ খসিয়ে ঈর্ষা আর ভর্ৎসনার ঝাঁজ ছড়াতে ছড়াতে বয়সের ভারে স্থূল শ্যাম শরীরটা এগিয়ে আসে।

তাকে দেখতে পেয়ে সিগারেট নামিয়ে লোকেন গুপ্ত বলেন, এখুনি যাচ্ছ নাকি প্রভা ?

হ্যাঁ একটু কাজ আছে।

লোকেন গুপ্ত ডাকেন, ড্রাইভার—

বাধা দিয়ে প্রভা বলে, না, না, গাড়ির দরকার নেই। আমি রাস্তা থেকে একটা কিছু নিয়ে নেব।

এই যে, তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই—মিস মিত্র আর ইনি মিস—নন্দিতার পদবীটা মনে নেই বলে লোকেন গুপ্ত থেমে গিয়ে হাসেন

নন্দিতা প্রভার দিকে তাকিয়ে শুকনো হেসে বলে, মিস রায়।

লোকেন গুপ্ত লক্ষ্য করেন না যে নন্দিতার হাসি প্রভা ফিরিয়ে দেয় না। ইচ্ছা করেই অবহেলার একটা ভঙ্গি করে। চাপা আক্রোশে নন্দিতা কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। আর প্রভা বোধ হয় লোকেন গুপ্তর সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা তাকে বোঝাবার জন্যে কথাবার্তার সুর রীতিমত আন্তরিক করে তোলে। তাঁর গায়ের কাছে সরে এসে খবরের কাজগটা তুলে নেয়। দু-একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারপর পিছন ফিরে বার বার তাকাতে তাকাতে নিচে নেমে যায়। আর তার বিষদৃষ্টি নন্দিতার মনে উৎকট জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

ঝিরঝিরে বাতাসে খোলা বারান্দায় বসে একটু একটু করে নন্দিতা প্রভার অশোভন ব্যবহারের অর্থ খুঁজে পায় সেই প্রথম দিনই। বয়সের ভারে স্থূল ওই মহিলা তাকে সন্দেহ করেছে। স্বাভাবিক একটা ভয়—যদি নন্দিতার মত যৌবন-সম্বল মেয়ে তাকে এক আঘাতে দূরে সরিয়ে নেয় লোকেন গুপ্তকে। তাই উৎসাহী হয়ে স্থূলত্ব অশিক্ষিত একটা মেয়ের মত সম্পর্কটা জানিয়ে দিয়ে গেল তাকে। বয়স হলে এমনি করেই কাণ্ডজ্ঞান হারায় নাকি মেয়েরা। সেখানে

বসেই অপমানের জ্বালা নন্দিতা একটু বেশী মাত্রায় অনুভব করে। কৌতুকের স্বাদও পায় মনের মধ্যে। আর জ্বালার ঘোরেই লোকেন গুপ্তর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার উগ্র নেশা তাকে পেয়ে বসে।

অনেকক্ষণ আগেই মোটা চেকটা ব্যাগে ভরে মামুলী ধন্যবাদ জানিয়ে হালকা শরীর কাঁপিয়ে এখান থেকে চলে যেত নন্দিতা। হাসির কল্লোল তুলে কৃতিত্বের অহঙ্কার প্রকাশ করত মিসেস চ্যাটার্জির কাছে। আর কোনদিন এদিকে আসত না—আর কোনদিন হয়তো লোকেন গুপ্তর সঙ্গে মুখোমুখি বসবার তার অবসর হত না।

কিন্তু নন্দিতার মনের অবচেতনে দম্ভ এক নতুন রূপ নেয়। এই অপমানটা প্রভাকে ফিরিয়ে দিতে চায় লোকেন গুপ্তকে উপলক্ষ্য করেই।' তাই তাঁর অনুরোধ রেখে সে বসে থাকে অনেকক্ষণ। দুষ্প্রাপ্য বিলিতী কাপে আলগোছে কফি খায়। একদিন একটা নেমন্তন্নে আসবে বলে ও সম্মতি জানায়। আর তাকে পৌঁছে দেবার জন্যে লোকেন গুপ্ত যখন ড্রাইভারকে লাল রঙের বুইকটা বের করতে বলেন তখন লৌকিকতা করে সে মৃদু আপত্তিও করে না।

শহরতলীর অপ্রশস্ত পথ বেয়ে ভারী মোটরটা সাবধানে এগিয়ে চলে। ঝাঁকুনি লাগে না। নরম পুরু গদিতে নন্দিতা তার হালকা শরীরটা এলিয়ে দেয়। চোখ দুটোও শৈথিল্যে বুজে আসে। আর মোটরের গতির তালে তালে মনে মনে সে বোধহয় একটু বেশী দূর এগিয়ে যায়।

আশ্বিনের মিঠে আমেজে দু পাশের একরাশ দীর্ঘ দীর্ঘ গাছের সবুজ পাতার দিকে তাকিয়ে তার রক্তের গতি হঠাৎ যেন বেড়ে যায়। একটা নতুন আভা ঝলসায় চোখে-মুখে। আর প্রথম দিনেই প্রথম কথা তার মনে হয় প্রভাকে মুছে ফেলতে হবে ও বাড়ি থেকে।

সেই মূর্তিটা আবার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। রূঢ়। গম্ভীর। বয়সের ভারে শ্লথ শরীর। কাঁচা-পাকা চুল। অপরিচ্ছন্ন থালার

মত বোকা-বোকা মুখ। নন্দিতার বয়সের বিদ্যুৎ-প্রভাবে দু-পাশের প্রাচীন গাছের মতো দ্রুত সরে যাচ্ছে ঐশ্বর্যবান লোকেন গুপ্তের প্রাসাদ শিখর থেকে। যৌবনের নেশায় চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে যায় নন্দিতার। ঠোঁট ঠিপে সে আপন মনে হাসে।

তারপর আর একদিন।

ভিজে-ভিজে পাথর কুচি। কাল সারারাত ঝরে পড়া হিমের ঠাণ্ডা চিহ্ন। নেপালী দারোয়ান নন্দিতাকে চিনতে পারে। এগিয়ে এসে সেলাম জানায়। তার সঙ্গে লোকেন গুপ্তর ঘনিষ্ঠতার কথা সে বুঝতে পেরেছে বলে খুশি-খুশি চোখে ওপরের সেই বারান্দার দিকে মাথা তুলে তাকায় নন্দিতা।

সা'ব হ্যায় ?

বিমার। আপ উপর যাইয়ে।

বিমার ? একটু চমকে উঠে নন্দিতা জিজ্ঞেস করে, কবসে ?

দো-চার দিন।

আজ আর দারোয়ান সঙ্গে যায় না। নন্দিতা পথ চেনে বলেই সিঁড়ির দিকে একটা হাত প্রসারিত করে সে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। হিলের টুকটুক শব্দ তোলে নন্দিতা। পাট-ভাঙা নতুন শাড়ির খস খস আওয়াজ। দামী এসেন্সের মিষ্টি গন্ধ। নিজের সৌরভ ছড়িয়ে ছড়িয়ে সে ওপরে উঠে যায়।

বেয়ারা সামনেই ছিল। ক্ষিপ্র হাতে পাখা খুলে দেয়। নিজের নাম বলে নন্দিতা। তাকে বসতে বলে বেয়ারা ভেতরে চলে যায়। একটু পরে ঘুরে এসে আর একবার বলে, বইঠিয়ে।

বারান্দার আর এক প্রান্তে হাওয়ায় পর্দা অল্প অল্প দুলছে। অনেক দূরে ফাঁকা মাঠ আর ছোট ছোট বাড়ি ছাড়িয়ে যেন কুয়াশা জমে আছে। চেনা-চেনা লাগে নন্দিতার। প্রথম দিনের মত অপরিচয়ের অস্বস্তি আজ তাকে ঈষৎ অস্থির করে তোলে না। হাত

বাড়িয়ে গোল টেবিলের ওপর থেকে ইংরেজী খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে সে চোখ বুলোয়।

পর্দা সরে যায়। চমকে মুখ তোলে নন্দিতা। কিন্তু শ্লিপার ঘষতে ঘষতে যে এগিয়ে আসে তাকে দেখে তার মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে। বিস্বাদে জিভ অসাড় হয়ে যায়।

আজ কিন্তু হাসে প্রভা। হাত তুলে আনন্দ প্রকাশ করে। তাকে দেখে ওর খুশি হয়ে ওঠার কি কারণ থাকতে পারে সে কথা নন্দিতা বুঝতে পারে একটু পরেই।

মিস্টার গুপ্তর অসুখ করেছে। আজ দেখা হবে না।

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলের ওপর রেখে নন্দিতা অন্য-দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমার নাম বলেছিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর একদিন আপনিই তো চাঁদা চাইতে এসেছিলেন?

শরীরের সব রক্ত যেন ছলাৎ করে জমাট বাঁধে নন্দিতার মুখে। সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রভাকে আঘাত করতে পারলেই সে খুশি হত। উত্তেজিত আঙুলে ব্যাগ খুলে লোকেন গুপ্তর নাম লেখা সাদা বড় খাম বের করে সে টেবিলের ওপর রাখে, আমি ওকে আমাদের ফাংশনে নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম—

কবে?

এখনও দেরি আছে—উনিশে অক্টোবর।

বোধ হয় যেতে পারবেন না।

প্রভার কথা নন্দিতা শোনে না। হাওয়ায় দোল খাওয়া একটা ছোট অর্কিডের দিকে তাকিয়ে এক পা এক পা করে নীল পর্দার দিকে এগিয়ে যায়, ওঁকে দেখতে পারি?

না। ডাক্তারের বারণ।

কথা শুনে থমকে দাঁড়ায় নন্দিতা। কি দরকার ছিল ওকে জিজ্ঞেস করবার। বেয়ারার সঙ্গে সোজা রুগীর ঘরে চলে গেলেই সবচেয়ে ভাল হত। এ বাড়ির কর্ত্রীর মত প্রভা যেন ওকে জোর

করে ঠেকিয়ে রাখতে চায়। এক রূপবান ধনী পুরুষকে নিজের ভোগের জন্যে জোর করে আগলে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা। কান দুটো কটকট করে ওঠে নন্দিতার। দেখা যাবে ও আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে তাকে। যেন তার একারই ও ঘরে যাবার অবাধ অধিকার। নিজের শরীরটার ওপর নিজেই একবার নন্দিতা চোখ বুলিয়ে নেয়। দেখা যাবে।

ঠিক আছে, পর্দার দিকে তাকিয়ে কথা বলে নন্দিতা, আমি পরে খবর নেব।

আগে টেলিফোন করবেন।

ঝাঁজালো দৃষ্টি নন্দিতা ছুঁড়ে মারে প্রভার দিকে। কাটা-কাটা নীরস স্বরে বলে—যেন বেহারার সঙ্গে কথা বলছে, কার্ডটা এক্ষুনি যেন পৌঁছে দেওয়া হয়—সেই স্থূল মূর্তির সঙ্গে আর একটি কথাও না বলে সে সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। বিকট একটা জ্বালার উদ্গীরণ চোখের সামনে থেকে বারান্দায় দাঁড়ানো ঈর্ষা-কাতর বয়স্ক নারী-শরীরটাকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ চূর্ণ করে মিলিয়ে দিতে চায়।

এই প্রত্যাখান তারই ছল। তারই কৌশল। নন্দিতার স্থির বিশ্বাস লোকেন গুপ্তকে জানানো হয় নি তার আগমন। যতই অসুস্থ হন, তিনি তাকে এমন করে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। প্রথম দিনই সে বুঝেছিল তার যৌবন-থরথর দেহ আকণ্ঠ তৃষ্ণার জোয়ার নামিয়েছিল রসগ্রাহী বৃদ্ধের পিপাসার্ত চোখে। যদি আজও তাঁর রোগ শয্যার ধারে গিয়ে নন্দিতা দাঁড়াত—টান টান হাতের মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিত তাঁর কপালে আর মাথায় তাহলে অলৌকিক তারুণ্যের নিবিড় তৃপ্তি তাঁকে এক নতুন যৌবরাজ্যের সন্ধান দিত। আর ওই রেখাঙ্কিত অক্ষম নারী-শরীরটা ঈর্ষার খোঁচায় এক কোণায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ এক সময় জ্ঞান হারিয়ে গড়িয়ে পড়ত ঠাণ্ডা মেঝের ওপর। হ্যাঁ, তাকে একদিন আছড়ে মাটিতে ফেলবে নন্দিতা। যেমন করে হোক। যত দেরিই হোক। যত ক্ষতিই হোক তার নিজের।

দু-চারদিন পর এক দুপুরে ক্লাবের আফিস-ঘরে বসে কার্ডের স্তূপ সামনে নিয়ে ঠিকানা লিখছিল নন্দিতা। আর কোথাও নিজের যাবার দরকার নেই। বাকি কার্ডগুলো বেয়ারা নিয়ে যাবে কিম্বা ডাকে ছাড়া হবে।

শরতের বিবর্ণ দুপুর। একটু আগে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়েছে। হাওয়ার ঝাপটায় রঙিন ক্যালেণ্ডারটা ঝুপ করে খুলে পড়েছে। এখনও ওটাকে টাঙানো হয় নি। মিসেস চ্যাটার্জি একটা মোটা ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছেন। নতুন যাদের ভর্তি করা হবে সেই নামগুলোর তালিকা সাজাচ্ছেন।

হঠাৎ টেলিফোন শব্দ করে ওঠে। মাথা না তুলে ক্লান্ত হাতে যন্ত্রটা একটু সরিয়ে এনে নন্দিতা বলে, হ্যালো! কিন্তু এক মুহূর্তে সে আশ্চর্য রকম সচেতন হয়ে ওঠে। চঞ্চল। বিচলিত। হাসি-হাসি মুখ। আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে টেলিফোনের ওপর।

লোকেন গুপ্তর স্বর। এখন একটু সুস্থ। সেদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে বার বার দুঃখ প্রকাশ করেন। এই রবিবার দুপুরে নন্দিতাকে খাবার নেমন্তন্ন করেন। অনুরোধের ভাষায় অনেক উচ্ছ্বাস মিশিয়ে বলেন, আসতেই হবে। না এলে খুব বেশি আঘাত পাবেন।

ধন্যবাদ, নিশ্চয়ই যাব—লোকেন গুপ্তর অনুরোধে অন্তরিকতার আভাস পেয়ে লজ্জায় একটু থিতিয়ে যায় নন্দিতার স্বর।

গাড়ি পাঠাব?

না, না। আমি নিজেই যাব।

হঠাৎ প্রভার কথা নন্দিতার মনে পড়ে যায়। সেদিন লোকেন গুপ্ত তাকে গাড়ি দিতে চাইলেও গেট খুলে হেঁটে বেরিয়ে গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও বেশ পরিণত হয়েছে বোধ হয়। সহজেই বুঝতে পারে যে বড় মোটর গাড়িতে সকলকে মানায় না। তাহলে আর একটু বেশি বোঝে না কেন—লোকেন গুপ্তর ঘরে কি বারান্দায় কি রোগশয্যার পাশে সে একেবারেই বেমানান?

সেদিন হালকা হেসে লোকেন গুপ্তকে আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখে নন্দিতা।

খাবার টেবিলে বসে আজ ইচ্ছে করেই একটু বেশি কথা বলছে নন্দিতা। হতাশার ঠাণ্ডা ঝাপটায় প্রথমে থমকে গিয়েছিল। আজও এসেছে প্রভা। তবে ওর চোখে আজ ঈর্ষা নেই। বোধ হয় হঠাৎ পরাজয়ের গ্লানিতে অবসন্ন। যেন যন্ত্রের মত ঠেলে দিচ্ছে প্লেট। গেলাস সরিয়ে রাখছে। বিষণ্ণ মুখ। কথা বলছে না।

আজ কথায় কথায় হাসির লহর তুলছে নন্দিতা ওকে শুনিয়ে। লোকেন গুপ্তর দিকে ঘন ঘন চোখ ফেরাচ্ছে ওকে দেখিয়ে। জমা-করা যত অপমান যেন এই খরদীপ্ত মধ্যাহ্নে চোখা একটা ঢিলের মত ছুঁড়ে মারতে চায় ওর দিকে। আঘাত খেয়ে নিজের দৈন্য বুঝুক প্রভা। তাকে এই বিরাট অট্টালিকার একক উত্তরাধিকারিণী করে বয়সের বোঝা নিয়ে সরে থাক।

রোদের প্রশস্ত সোনালী রেখা এসে পড়েছে ঘরের জানলার কাচের ওপর। একটু ঝুঁকে তাকালে আকাশ দেখা যায়। যেন স্থির কাশবন। কিন্তু নন্দিতার চোখ সেদিকে নেই। প্রকৃতির চেয়ে পুরুষ আজ এই মধ্যাহ্নে তার কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। হালকা হলুদ রঙের শার্ট কী আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে লোকেন গুপ্তর গায়ের রঙের সঙ্গে! শরীরটা যেন যৌবনের দীপ্তিতে জ্বলছে। হাসির মুহুর্মুহু আওয়াজে এক তরুণ যেন অভিনন্দ জানাচ্ছে নন্দিতাকে। কাল তার কাছে বিমূঢ়—শঙ্কিত। বয়স পরাস্ত।

একদিকে জীবন। আর একদিকে পূর্ণ সুধাপাত্র। লোকেন গুপ্ত আর নন্দিতা রায়। মাঝখানে এক ক্লান্তিকর ছন্দপতন। মৃত্যুর হিম-ইঙ্গিত। একটা শ্লথ শ্যাম শরীর। হেরে যাচ্ছে। জমে জুড়িয়ে পরিণত হচ্ছে ব্যর্থতার শিলীভূত কঠিন প্রস্তরে। সৌন্দর্যের উত্তাল প্রান্তরে ধূলিরুক্ষ আবর্জনার মত।

ইহুদী মেনুইনের রিসাইটেল এবারে আপনি শুনেছিলেন মিস্টার গুপ্ত ?

চামচে টুং টুং শব্দ নন্দিতার প্রশ্নে থেমে যায়, ও নো। আই মিসড্ হিম। ব্যাপারটা জানতে পারলাম মেনুইন চলে যাবার পর, রসিকতা করে লোকেন গুপ্ত বলেন, শহরের বাইরে থাকি। গেঁয়ো লোক। কে আর আমাকে খবর দেবেন বলুন ?

কৌশলে প্রভার মেঘ-থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতাও পাল্টা রসিকতা করে, আমি কি মাঝে মাঝে গেঁয়ো লোকটিকে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারি ?

অ্যাম আই সো লাকি ? হা-হা করে হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত।

ঝন করে একটা শব্দ। জল খেতে গিয়ে গেলাসটা প্রভার হাত থেকে মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। বেয়ারা যখন সেগুলো তুলতে থাকে তখন সাবধানে আর এক চামচ ফ্রায়েড রাইস নিয়ে নন্দিতা আবার কথা বলে, আমাদের ক্লাবে মাঝে মাঝে আসবেন। খুব ভাল লাগবে।

উৎসাহী চোখ তুলে লোকেন গুপ্ত বলেন, যাব ?

আপনি এলে আমি—আমরা সকলেই খুব খুশি হব। আর পরশু তো আমাদের শো। সেদিন আপনাকে যেতেই হবে। আমি কিন্তু বাইরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।

আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি লাকি, আর একবার হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত।

এবার কোন কাচ ভাঙার শব্দ হয় না। কিন্তু মনে মনে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পায় নন্দিতা। কালো পাথরের মত মূর্তিটা অল্পে-অল্পে ভাঙছে। নিঃশব্দে। অলক্ষ্যে।

ভেবেছিল সরে যাবে। কিন্তু না। ভুল হয়েছিল নন্দিতার। ত্বক শিথিল হয়ে গেলে বোধ হয় অপমান সহজে গায়ে বেঁধে না। আর তা

ছাড়া বিপুল সম্পত্তির মায়া কি অত সহজে ছাড়ে যৌবন ফুরিয়ে যাওয়া নিরানন্দ পাণ্ডুর কোন স্ত্রীলোক ?

নন্দিতা তাকে একবারও আসতে বলে নি, তবু বোধ হয় আত্মার সম্পর্ক জাহির করবার জন্যে রবাহুতের মত এসেছে লোকেন গুপ্তের সঙ্গে। বোবা হয়ে গেছে নন্দিতার দীপ্তি দেখে। মাটির দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে আছে। কিছু শুনছে কি না শুনছে নন্দিতা বুঝতে পারে না। বোঝবার চেষ্টাও করে না। ও যেন একটা মানুষই নয়।

আর লোকেন গুপ্তর চোখ চঞ্চল শ্যেনের মত এদিক-ওদিক ছুটছে, একবার মঞ্চের দিকে, একবার পাশে, কখনও কখনও পিছনে। শাড়ি আর প্রসাধন। রূপ আর ঘ্রাণ। লোকেন গুপ্ত প্রাণভরে এক লোভনীয় পরিবেশের স্বাদ গ্রহণ করছেন। তার পাশের স্থবির শরীরটা তখন কুঁকড়ে যাচ্ছে। চঞ্চল রক্তের উদ্দাম গতির মোড় ফেরাবার কোন ক্ষমতা নেই তার।

কেমন লাগছে মিস্টার গুপ্ত ? বিরামের অবসরে নন্দিতা এসে জিজ্ঞেস করে। চমৎকার, তাকে দেখতে দেখতে লোকেন গুপ্ত বলেন, সবই তো আপনার ক্রেডিট—

নন্দিতা হেসে আর একটু সরে আসে। লোকেন গুপ্তর মাথায় ব্রিলেন্টিনের গন্ধ। বুক-পকেটের রুমালে এসেন্সের সৌরভ। সে জোরে নিশ্বাস টানে, শেষ হয়ে গেলে যাবেন না। আমি আসব কিন্তু—

বেশ বেশ। মে আই গিভ ইউ এ লিফট ?

ধন্যবাদ।

বেশি রাত হয় না। নটারও আগে অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায়। সব গুছিয়ে আসতে একটু দেরি হয় নন্দিতার। এদিকে আর কেউ নেই। বড় রাস্তার ওপর গাড়ির সারি ছোট হতে হতে মুছে গেছে। শুধু একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে ক্লাবের গা ঘেঁষে। লাল বুইকটা নয়। আজ অন্য আর একটা গাড়ি চালিয়ে এসেছেন লোকেন গুপ্ত। ড্রাইভার নেই। নিজেই স্টিয়ারিং এ হাত রাখেন।

ভদ্রতা করে লোকেন গুপ্তর অনুরোধের অপেক্ষা করতে পারত নন্দিতা। হয় তো তিনি নিজেই প্রভাকে পিছনে বসতে বলতেন কিন্তু কিসের একটা তাগিদে পিছনের দরজা খুলে নন্দিতা প্রভাকে ওঠবার ইঙ্গিত জানায়। ওখানেই বসুক ব্যর্থ মানুষটা। আর লোকেন গুপ্ত দরজা খুলতে না খুলতেই সে বসে পড়ে তাঁর পাশে।

কোনদিকে? সাদা মোটরটা যেন হাঁসের মত সাঁতার কাটে।

যেদিকে হয়, লোকেন গুপ্তর গা ঘেঁষে নন্দিতা হাসে।

কোনও তাড়া নেই তো?

না, না।

তাহলে কোথাও গিয়ে একটু কফি খাওয়া যাক, ঘাড়টা একটু কাত করে লোকেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করেন, কি বল প্রভা?

পিছনে ঝিমিয়ে থাকা শরীরটা যন্ত্রণায় যেন ছটফট করে ওঠে, আমার একটু কাজ আছে। দয়া করে আমাকে আগে নামিয়ে দিন—

এইবার বুঝেছে। এইবার সরে যাবে। জয়ের তীব্র আনন্দে একটা বেপরোয়া আমেজ নন্দিতার হালকা শরীরটাকে আরও হালকা করে দেয়। মনে হয় গাড়িটা বড় আস্তে চালাচ্ছেন লোকেন গুপ্ত—গতির লক্ষ গুণ বেশি বেগ এই মূহূর্তে দরকার তার।

প্রভা নেমে যাবার একটু পরে নন্দিতা ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, উনি আপনার কে মিস্টার গুপ্ত?

আমার কে, জোরে হাসেন লোকেন গুপ্ত, কেউ না। জাস্ট এ ফ্রেণ্ড।

জিজ্ঞেস করতে চায় নি নন্দিতা। কিন্তু হঠাৎ ওর জিব যেন সংযম হারায়, আর আমি—জ্যাস্ট এ ফ্রেণ্ড নাকি?

ও নো। তুমি? নন্দিতার একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে লোকেন গুপ্ত হেসে বলেন, কি বলব?

মুখ নামিয়ে চাপা স্বরে ফিসফিস করে ওঠে নন্দিতা, আমাকে আপনার যা মনে হয়—

রিয়েলি ? নন্দিতার কাঁধের ওপর আলগা একটা হাত এসে পড়ে। ধরা ধরা গলার স্বর, ইফ আই সে—সুইট-হার্ট !

মাথা ঝিমঝিম করে নন্দিতার। বুকে সমুদ্রের উন্মাদনা। লজ্জা-থর থর শরীর ছিনিয়ে নেওয়ার তৃপ্তিতে এলিয়ে পড়ে লোকেন গুপ্তর সুঠাম কাঁধের ওপর। আর তখন ঠোঁটে উষ্ণ স্পর্শ। যেন জলে হালকা পাথর কুচি ফেলার ছলাৎ শব্দ।

সী মি ভেরি অফন প্লিজ।

জড়সড় নন্দিতা ভাঙা গলায় থেমে থেমে বলে, মাঝে মাঝে সকালে যাব—

সকালে ? একটু ভেবে লোকেন গুপ্ত বলেন, নটা-সাড়ে নটায় তাছাড়া যে-কোন সময়। জাস্ট গিভ মি এ রিং—তৎপর হাতে ব্রেক কষেন তিনি।

প্রবল একটা ঝাঁকুনি। আর একটু হলেই কালো বেড়ালটা চাপা পড়ত। ভীত দৃষ্টিতে মোটরের আলোর দিকে তাকায়। তারপর একটা ছোট বাড়ির পাঁচিল টপকে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিকে তাকিয়ে হাসির কলকল বেগ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না নন্দিতা। তার হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে লোকেন গুপ্ত ক্লাচ ছাড়তে ছাড়তে বলেন, খুব বাঁচিয়ে দিয়েছি—

হাসতে হাসতেই নন্দিতা বলে, আমি হলে ঠিক চাপা দিয়ে দিতাম।

চৌরঙ্গির বড় একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে মোটর থামে।

ইচ্ছে করেই এর মধ্যে একদিনও গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এর দিকে যায় নি নন্দিতা। আর একটু সময় যাক। আর কয়েকবার অনুরোধ আসুক। তার মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে লোকেন গুপ্ত আরও অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠুন। সে জানে তাঁকে আসতেই হবে তার কাছে। নন্দিতার পাতলা ঠোঁটের উষ্ণ স্পর্শ লোকেন গুপ্তকে যে স্বাদ দিয়েছে প্রভার সাধ্য নেই সেই একই অনুভূতি তাঁর মনে জাগিয়ে দেবার। তাই

নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে নন্দিতা। একটা ঝাঁজালো আনন্দে কানায়-কানায় ভরে ওঠে।

ভিজে ধোঁয়াটে সন্ধ্যা পেচিয়ে পেঁচিয়ে শহরকে জড়াচ্ছে। আজ একটু বেশিক্ষণ ক্লাবের আপিস-ঘরে বসে থাকতে হবে নন্দিতাকে। মিসেস চ্যাটার্জি কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হবে। তারপর নন্দিতার ছুটি। ট্রামে সোজা বাড়ি যেতে হবে তাকে। আর কোথাও নয়।

সাদা টেলিফোনের ওপর আস্তে হাত রাখে নন্দিতা। এক তাল বরফের মত ঠাণ্ডা একটা যন্ত্র। ঘুমে অচেতন। বিদ্যুৎ প্রবাহে হঠাৎ সজাগ হয়ে কোন কথা তাকে শোনায় না। অল্প অল্প অস্বস্তি দানা বাঁধে। হাঁসের মত সেই সাদা মোটরটা স্থূল একটা শরীরকে নিয়ে কতদূর চলে গেছে কে জানে। টেলিফোনটা তুলে কথা বলতে ইচ্ছে করে নন্দিতার! আর ঠিক তখন জানলা দিয়ে সে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই সাদা মোটরটাই এসে দাঁড়ায় ক্লাবের সামনে। চেনা হর্ন একবারই তাকে ডাকে। ক্ষিপ্র পায়ে নন্দিতা রাস্তায় নেমে আসে।

সে পৌঁছবার আগে মোটর থেকে নেমে পড়েন লোকেন গুপ্ত। সিগারেট মুখে দিয়ে এদিক ওদিক তাকান। নন্দিতাকে দেখে দু পা এগিয়ে এসে হাসি হাসি মুখে বলেন, তারপর? কোন খবর নেই—কেমন আছ?

আসুন, আসুন, খুশির হঠাৎ জোয়ার কোথা থেকে আসে নন্দিতা বুঝতে পারে না, আমি একটু আগেই আপনার কথা ভাবছিলাম, চোখ ফিরিয়ে এক মুহূর্তে মোটরের ভেতরটা দেখে নিয়ে সে যেন একটা অস্বাভাবিক প্রশ্ন করে, আর কেউ আসে নি?

আর কে আসবে? টিপে টিপে লোকেন গুপ্ত হাসেন, এবার থেকে তোমার কাছে আমার তো একাই আসবার কথা, ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তিনি বলেন, ডোণ্ট ইউ থিঙ্ক সো?

ও শিওর, একটু বেশি তাড়াতাড়ি পা ফেলে নন্দিতা। চোখ দুটো

জ্বলজ্বল করে। সামনে যা দেখে, চেয়ার-টেবিল, জানলা-দরজা, শাড়ি আর পর্দা—সব কিছুই যেন একটা ভাষা খুঁজে পেয়েছে। শুধু সে নিজেই এলোমেলো উল্লাসে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে ভুলে গেছে।

আর ভাবনা নেই। নির্ভুল হিসেব তার, প্রভাকে সে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। লোকেন গুপ্ত নিজেই বললেন, এবার থেকে একাই আসবেন তিনি। আর একটা কথা তিনি না বললেও নন্দিতা বুঝতে পারে যে, সে যখন গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এ যাবে তখন পর্দা সরিয়ে একটা অপরিচ্ছন্ন মুখ তার শিরায়-শিরায় জ্বালা ধরিয়ে দেবে না। এর জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। তাকে আর কিছু করতে হবে না। লোকেন গুপ্ত তাকে পুরোপুরি পাবার জন্যে মনের তাগিদে সব শুকিয়ে যাওয়া জিনিসকে নিজেই ফেলে দেবেন।

ক্লাবের লাউঞ্জে লোকেন গুপ্তকে নিয়ে আসে নন্দিতা। একটা চেয়ার আস্তে টেনে তাকে বসতে বলে। নিজে বসে পড়ে তার মুখোমুখি। আঙুলের ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে দু-কাপ কফি আনতে বলে লোকেন গুপ্তকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই। হঠাৎ উঠে গিয়ে পাখাটা আর একটু জোর করে দেয়।

মাথার উপর বেশি পাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। বড় বড় হলদে শেড। কাছাকাছি কেউ নেই। এখান থেকে দেখা যায় সামনের বড় ঘরে দু-চারজন কলেজের মেয়ে টেবিল-টেনিস খেলছে। শুধু তারই টকা-টক আওয়াজ। আজ কিন্তু কোনদিকে তাকান না লোকেন গুপ্ত। এক দৃষ্টিতে শুধু নন্দিতার দিকেই তাকিয়ে থাকেন। একটা হাত ছড়িয়ে দেন সামনের ছোট টেবিলটার ওপর। আর নন্দিতার মনে হয় নিগূঢ় রহস্যের জালে তাকে যেন পাকে পাকে বেঁধে ফেলেছে।

কই, একদিনও তো গেলে না। কি ব্যাপার? কফির কাপে চুমুক দিয়ে ভয়ে ভয়ে লোকেন গুপ্ত জিজ্ঞেস করেন, আমার দিক থেকে কোন অন্যায় হয়ে গেল নাকি?

মাথা ঝাঁকিয়ে নন্দিতা বলে, না না।

তাহলে ?

এবার ঠিক যাব—

ঠিক, কফির কাপটা ঠেলে দিয়ে লোকেন গুপ্ত বলেন, না হলে আমাকেই আসতে হবে তোমার কাছে—আই মাস্ট সী ইউ এভরি ডে।

এভরি ডে ? গুনগুন করে উঠে নন্দিতা। সোজা চোখে তাকাতে পারে না লোকেন গুপ্তর দিকে। ভর দেবার একটা জায়গা থাকলে হয়তো নিজের শরীরটা পুরোপুরি ভেঙে দিত।

পকেট হাতড়ে রূপোলী লাইটার বের করে ক্লিক শব্দ করেন লোকেন গুপ্ত। ভাসা-ভাসা দৃষ্টি। বর্ষার ঠিক আগে গাছপালার মত করুণ। মুখের সামনে থেকে হাত দিয়ে ধোঁয়া সরিয়ে দিয়ে বলেন, হ্যাঁ রোজ। যদি তুমি বাধা না দাও আমি রোজই আসব।

আমিও যাব।

ভেরি গুড, লোকেন গুপ্তর ঠোঁটের মাঝখানে সিগারেট ওঠে-নামে, একেবারে একা। আই অ্যাম সিক অব ইট !

সমবেদনার ভারী ছায়া নামে নন্দিতার মুখে, একা-একা রইলেনই বা কেন এতদিন ?

হা-হা করে হেসে ওঠেন লোকেন গুপ্ত, কারণ নন্দিতা রায়ের মত ছোট্ট একটি জীবন্ত মেয়ে আমাকে বুঝিয়ে দেয় নি যে আমি সাংঘাতিক রকম একা—

আমার লাক্।

না, বাধা দিয়ে লোকেন গুপ্ত বলেন, ওটা আমার। কারণ অ্যাই অ্যাম অ্যান ওল্ডম্যান—

এবার নন্দিতা বাধা দেয়, বাট ইউ আর ইয়ং অ্যাট হার্ট মিস্টার গুপ্ত।

রিয়েলি ? হাসতে হাসতেই লোকেন গুপ্ত ওপরে তাকান, কী প্রচণ্ড আলো তোমাদের এখানে !

একটা নিবিয়ে দেব ?

দাও, হঠাৎ ভারী হয়ে আসে লোকেন গুপ্তর গলার স্বর, তুমি তো জ্বলবেই আমার সামনে। আর ওই আলোর চেয়ে অনেক বেশি তোমার দীপ্তি।

টিক করে একটা শব্দ। সবচেয়ে বেশি পাওয়ারের বাল্‌বটা নিবে যায় কিন্তু পাতলা সোনালী তারে আলোর লালচে রেশ লেগে থাকে। আর এদিকে হাল্কা অন্ধকার ফুরিয়ে যাওয়া গোধূলির মত কাঁপে।

ঘুরে এসে নন্দিতা আবার বসে পড়ে চেয়ারে। এখন সে শুধু নিজেই জ্বলে না। তার চোখের সামনে উষ্ণ অন্ধকারে জ্বলে শহরতলির এক বিশাল অট্টালিকা। গ্যারেজে দু-তিনটে মোটর। খাবার ঘরে বৃহৎ এক রেফ্রিজারেটার। ঐশ্বর্যের নানা রঙ। কিন্তু সামনে যে মানুষটি বসে আছেন—শেষ অবধি সব ছাড়িয়ে তাঁর দীপ্তিই নন্দিতার মনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়।

মিসেস চ্যাটার্জি ফিরে আসেন একটু পরে।

আজ এক সঙ্গে বসে প্রাতরাশ খাবার জন্যে লোকেন গুপ্ত নন্দিতাকে গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এ আসতে বলেছিলেন সকাল নটা—সাড়ে নটায়। হয়তো ওটা ঠিক প্রাতরাশের সময় নয়। কিন্তু তাঁর চিরকালের অভ্যাস। নন্দিতার অসুবিধা হবে মনে করে তিনি বোধ হয় একটু বিব্রতও হয়ে পড়েছিলেন।

তাঁর একটা হাত ধরে নন্দিতা হেসে বলেছিল, তার কোন অসুবিধা হবে না। ওটা তারও প্রাতরাশের সময়। কিন্তু অধিকার বোধের একটা উত্তাল ঢেউ নন্দিতাকে অনেক আগে ঠেলে নিয়ে আসে গ্রোভ অ্যাভিনিউ-এর দিকে।

প্রথম কার্তিকের হিম-কুয়াশার সকাল। অল্প-অল্প শীত। বারান্দায় বসে আজ নন্দিতা আবার তাকায় চারপাশে। আর কেউ নেই। পুকুরের জলে আর ঝড়ের ধুলো-লাগা অশ্বত্থের শুকনো পাতায় শুধু কচি রোদের মত বয়সের অহংকার স্থির হয়ে আছে।

নন্দিতা উঠে দাঁড়ায়। বারান্দার ফাঁক-ফাঁক নিচু রেলিঙে হাত রাখে। হালকা ছোঁয়ায় গালের কাছে থমকে-থাকা দুর্লভ বিদেশী অর্কিডটাকে দুলিয়ে দেয়। হাওয়ার ঝাপটায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দূরের ভারী নীল পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হয়তো এখনও লোকেন গুপ্তর ঘুম ভাঙে নি। বেয়ারা টেবিলে প্রাতরাশের সরঞ্জাম সাজিয়ে রেখেছে কি-না, নন্দিতা ঠিক বুঝতে পারে না। বুকের মধ্যে প্রবল একটা তাগিদ অনুভব করে সে। লৌকিকতা ভুলে সোজা ভেতরে গিয়ে বেয়ারাকে সরিয়ে দিতে চায়। লৌকিকতার দরকার কি এখন! চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নিজে অপেক্ষা করতে চায় লোকেন গুপ্তর জন্যে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি দেখুন তাকে নিকটতম আত্মীয়ার মত।

হাওয়ায় ভারী নীল পর্দা ওঠে নামে। যেন একটা ঝকঝকে মুখকে আড়াল করে রেখে খেলা করে নন্দিতার সঙ্গে। পা টিপে-টিপে সে ওদিকে এগিয়ে যায়। ভেতরে যেতে এখন আর কোন বাধা নেই। তবুও সে ইতস্তত করে। পর্দার একটা কোণ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ।

যখন টেবিলের ওপর খবরের কাগজগুলো সাজিয়ে রাখবার জন্যে বেয়ারা বাইরে আসে তখন নন্দিতা হেসে তাকে জিজ্ঞেস করে, সা'ব উঠা?

হ্যাঁ মেমসাব।

কেয়া করতা?

তৈয়ার হোতা। আবভি ব্রেকফাস্ট খায়গা।

একটু ইতস্তত করে আবার নন্দিতা জিজ্ঞেস করে, আউর কোই হ্যায়?

হাঁ। উ মিত্র মেমসাব—

মিত্র মেমসাব! যেন গোঙানির মত একটা আওয়াজ। দেখতে দেখতে কড়া ঝাঁজের একটা রঙ বিকৃত করে তোলে নন্দিতার খুশি-খুশি টানা মুখ। উত্তেজনার ভাঙাচোরা ঢেউ-এ তার সমস্ত শরীর

ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে ওঠে। ভোগী বৃদ্ধের সব ছলনা আজ সে চুরমার করে দিয়ে যাবে। আর একটু হলেই সব ভুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে লোকেন গুপ্তর মুখোমুখি দাঁড়াত নন্দিতা। কিন্তু ঠিক তখন হঠাৎ জোর হাওয়ায় পর্দাটা অনেকখানি উঠে যায়। আর রূঢ় একটা ধাক্কায় নন্দিতা ছিটকে আসে বারান্দার এ-প্রান্তে। স্থির হয়ে অশ্বত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিহ্বল। বোবা চোখ।

লোকেন গুপ্তকে চিনতে খুব বেশি দেরি হয় নি তার। পেঁজা তুলোর মত সাদা চুল। চুপসে যাওয়া গাল। টেবিলের ওপর নকল দাঁতের পাটি। আর একদিকে বোধ হয় কলপের শিশি।

কিন্তু নন্দিতার চমক সেজন্যে নয়। সে প্রভাকেও দেখেছে লোকেন গুপ্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কলপের শিশি খুলছে। নকল দাঁতের পাটি এগিয়ে দিচ্ছে তাঁর হাতের কাছে। আর অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে প্রভার রেখাঙ্কিত মুখে। জোর হাওয়ার ঝাপটায় নন্দিতা এক মুহূর্তেই দেখে নিয়েছে সেই শ্লথ শ্যাম শরীরটার কাছে লোকেন গুপ্তর নিশ্চিন্ত আত্মসমর্পণ—বয়সে-বয়সে সন্ধির স্বাভাবিক এক দৃশ্য।

একটা বড় রোলার এসে দাঁড়িয়েছে কাঁচা রাস্তার ওপর। অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে। এখুনি হয়তো ঘড়ঘড় আওয়াজ করে ছটফট করতে থাকবে রোলারটা। তার আগেই নন্দিতা এখান থেকে চলে যাবে। নিজের বয়সটা তীক্ষ্ণ খোঁচা দিয়ে তাকে যেন ঠেলে দেয় সিঁড়ির দিকে।

পর্দাটা তখনও ওঠে নামে। এদিকে নন্দিতা। ওদিকে প্রভা। আসল মানুষটাকে প্রভার জন্যে আড়াল করে মাঝখানে ওই খসখসে পর্দাটা থাকবেই যতদিন নন্দিতার বয়স থাকবে ততদিন। সেদিকে তাকিয়ে নন্দিতা নিবে যায়।

আর একটু পরেই প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসবেন লোকেন গুপ্ত। হাসতে হাসতে তাকে টেনে নিয়ে যাবেন খাবার টেবিলে। কিন্তু আজ বোধ হয় একটা কথাও বলতে পারবে না নন্দিতা। আর

লোকেন গুপ্তর নকল ঝকঝকে মুখ প্রভার কাছে তার বিপুল হারের কথাটা মনের মধ্যে ফেনিয়ে তোলবার আগেই সে সরে যেতে চায়।

আস্তে আস্তে নন্দিতা সিঁড়ি ভাঙে। কোনদিকে তাকায় না। শুধু নিজের চেহারাটা একবার দেখতে চায়। কিন্তু আজ তার ব্যাগে আয়না নেই। দরকারই বা কি! বাড়ি থেকে খুব সকালে বেরোবার আগে আলো জ্বেলে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছে। নিখুঁত মুখ। যৌবন-টলমল শরীর। ঘন কালো চুল।

নামতে নামতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে নন্দিতা। দুটো অসাবধান আঙুল গালে ছোঁয়ায়। চোখ নামিয়ে ঠাণ্ডা সাদা সিঁড়ি দেখে। একদিন তার মুখেও রেখা পড়বে। এই যৌবনের কোন চিহ্ন থাকবে না শরীরের কোথাও। একটি-একটি করে মাথায় দেখা দেবে কাঁচা-পাকা চুল।

আর—হীলের আওয়াজ চেপে আবার নন্দিতা পা ফেলে। যখন বয়সের ভারে তারও শরীরটা স্থূল হয়ে আসবে তখন এক আঘাতেই প্রভাকে সে সরিয়ে দিতে পারবে। কোন প্রয়োজন হবে না ওই পর্দার। কিন্তু তাঁর এখনও অনেক—অনেক দেরি।

লোকেন গুপ্ত ততদিন বেঁচে থাকবেন কি!

২৬শে আগস্ট: ১৯৫৯
রবিবার রাত্রি: কলিকাতা

চন্দন ধূপ ঃ বুনো গন্ধ

সকালটা রাতের মতই। আবছা অন্ধকার।

মশার বিরক্তিকর গুনগুনানি। মশারি নেই। সুরবালার সারা শরীরে চাপ চাপ ঘাম। হাত বাড়িয়ে পাখাটা টেনে নেবার আগেই নন্দ পাশ ফেরে। কথা বলে না। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে।

অস্বস্তির খোঁচায় সুরবালা মুখ ফেরায়। স্বামীর দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। বিছানায় শুয়ে থেকে লোকটা যেন কেমন অদ্ভুত ধরনের হয়ে গেছে! কারণ থাক বা না থাক, সুরবালার চলনটা সোজা মনে হয় না। তাকে যত দেখে তত খিটখিট করে। দোষটা কি সুরবালার?

আজ একটু আগেই সে উঠে পড়ে। ভয়ে তাকায় না নন্দর দিকে। একবার শুরু করলেই হল। তারপর যতক্ষণ সুরবালা বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ ছুটবে তার কথার চোখা-চোখা বাণ। যেন তাকে সে সারা জন্মের মত চড়া দামে কিনে রেখেছে। খেতে দিতে পারুক বা না পারুক, খোঁটা দেবার অধিকার বজায় থাকবে পুরো-পুরি। লোকটা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন। আধ-ময়লা শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলে সুরবালা।

বারোয়ারী কলতলায় এখন ভিড় নেই। ইচ্ছে করলে সে দু-এক মিনিটের মধ্যেই কাজ শেষ করে চলে যেতে পারে। কিন্তু যায় না। ভরপাওয়া মেয়ের মত মাথা তুলে নীলচে আকাশ দেখে। পুরু পাঁজা পাঁজা তুলো মেঘ। বলিষ্ঠ পুরুষের মত। ভোরের চোখ-ধাঁধানো আলো আর বোধহয় আদিম সমুদ্র থেকে ছুটে-আসা বাধা-না-মানা বাতাস সুরবালাকে যেন শক্ত বাঁধনে জড়ায়। চোখ দুটো বুজে আসে।

এখন কটা বেজেছে? এখন ডালহৌসী স্কোয়ারে হাওয়ার জোর হয়তো আরও অনেক বেশি। আকাশের রঙটাও অনেক চকচকে। পুকুরের ধারে হিন্দুস্থানী চীনেবাদামওয়ালা আর একচোখো বুড়ি পানওয়ালী এখনও নিশ্চয়ই ঝুড়ি নামিয়ে বসে নি পাশাপাশি। ট্রামগুলো যাচ্ছে ঠিক ঢং ঢং ঘণ্টা বাজিয়ে কিন্তু কেউ যে উঠছে-নামছে না সে কথা সুরবালা নিজের থেকেই যেন কেমন করে বুঝতে পারে।

একদিন চুপে চাপে নন্দ ওঠবার আগে একা-একা ট্রামে বসে ডালহৌসী স্কোয়ারের শোভা দেখবার সাধ হয় তার। সব দোকানপাট বন্ধ। এদিকে-ওদিকে লোহার বড় বড় টানা গেটে ভারী তালা। আর অফিসগুলোও যেন ঘুমোয়। সুরবালার মত। নন্দর মত।

তখন একটা কৌশল করে যদি ঘড়িওয়ালা বিরাট বাড়িটার চার তলায় পা টিপে টিপে উঠে যাওয়া যায়! হাতে ধূপের থলিটা নেই। দৈন্যের ছাপও প্রকট হয়ে ওঠে নি মুখে। ঘামের গন্ধ না। সুরবালার গায়ে আতরের কড়া ঝাঁজ। পানের রঙে লাল ঠোঁট। শাড়ির কোথাও তালি পড়ে নি। পায়ে একটা ঝকমকে চটি। আকাশের মত নীলচে রঙের।

আর যদি সিঁড়ি টপকে-টপকে উঠে আসে ভবেন সুরবালার মত অদ্ভুত একটা কৌশল করে! যদি তখন দুজনে এসে দাঁড়ায় ঘরের বাইরে লম্বা ওই ফাঁকা জায়গাটায়—যেখান থেকে দিনের মধ্যে হাজার বার জাহাজের বাঁশি শোনা যায়। তখন একশো জোড়া ড্যাবা ড্যাবা চোখ ঘুরে-ফিরে দেখবে না ওদের। চাই কি তখন সাহস করে ভবেন ওকে বুকে চেপে ধরতেও পারে। অনেকক্ষণের জন্যে। সুরবালার দম বন্ধ হয়ে না আসা অবধি। ভবেনকে এমনি একটা ফাঁকা জায়গায় নির্জনে পেলে একটা না একটা কিছু যে ঘটে যাবে সে কথা তার চাউনি দেখেই সুরবালা বুঝতে পারে।

ঘটুক। ধিকি-ধিকি আগুনটা নিবুক শরীরের। তার দেহ ছেড়ে

সেই কড়া তাপ ভবেনের পাঁজর পুড়িয়ে পুড়িয়ে তাকেও সুরবালার মত করে তুলুক। খালি শক্ত হাতের বেড়িতে গুঁড়িয়ে যাবার সাধ।

কিন্তু চোখ দুটোই শুধু কথা বলে এক-অফিস লোকের সামনে। শরীরের আর কোন অঙ্গ না। থলি খালি করে ধূপের সারি সাজায় সুরবালা ভবেনের টেবিলে। হাসে। ঢুক-ঢুক করে অনেকক্ষণ ধরে চা খায়। তারপর নিজেই এক সময় মনে মনে হিসেব করে জানায় যে ধূপকাঠির ন'টা প্যাকেটের দাম সবসুদ্ধ দুটাকা পঁচিশ নয়া পয়সা। আর নেই। থাকলে বাকিগুলোও দিত। অত ধূপ নিয়ে কি করবে ভবেন!

অফিসপাড়ায় রোজ নিয়ম করে ঘোরাই সুরবালার কাজ। এ বাড়ি ও বাড়ি। এ-টেবিল ও-টেবিল। কেউ কেউ মাথাই তোলে না। মুখ নামিয়ে যেমন কাজ করছিল তেমন করে যায়। তবুও মিনতির ব্যগ্র দৃষ্টি চোখে ফুটিয়ে লোকটার মাথা তোলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে সুরবালা। বেশী না। এক প্যাকেট নিলেই চলবে।

নিন না। বড় উপকার হয়।

বোবা নাকি লোকটা! কথা বলে না। তালি-দেওয়া শাড়ি আর খাওয়ার অভাবে শুকিয়ে যাওয়া মুখ দেখে কোনই করুণা হয় না। হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে। একটু দূরে গিয়েই সুরবালা শুনতে পায় লোকটা আপন মনে গজগজ করে, মাইনের দিনের কথা এরা কেমন করে ঠের পায়! আশ্চর্য!

কথা শুনে উৎসাহ সুরবালার বেড়ে যায় হঠাৎ। প্রথমে একেবারেই খেয়াল করে নি। আজ পয়লা তারিখ বটে। অভ্যাসমতই ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পড়েছে এই অফিসে। দিনক্ষণের কথাটা মাথায় আসে নি। তাহলে হয়তো থলির মধ্যে ধূপের আরও কয়েকটা বাক্স ভরে নিত। পয়লা তারিখেই বিক্রি কিছু বেশী হয়। লোকের এই ধূপকাঠির সত্যি প্রয়োজন যে থাকে না সে কথা সে জানে। একটু বেশি মাত্রায় সাধাসাধি করতে হয়। তখন মাসের প্রথম দিক হলে

দয়া করে পকেটে হাত ঢোকায় মানুষ। আর পয়লা তারিখ হলে তো কথাই নেই।

লোকটাকে প্রথম দিন কেমন ভয়-ভয় লাগে সুরবালার। এখানকার আর পাঁচজনের মত নয়। সাহেব-সাহেব চেহারা। সব সময়ই হাতে সিগারেট ধরা। টানা মুখ। ভরা স্বাস্থ্য। শরীরটা রীতিমত মজবুত। দেখলেই প্রাণটা ছটফট করে। কিন্তু এ লোকটাও হয়ত অন্যটার মত বোবা হয়ে বসে থাকবে। হাতের ইশারায় সরে যেতে বলবে তাকে। কে জানে! ক্ষিধেও পেয়েছে জোর। কোন সকালে আধপেটা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তারপর এক ফোঁটা জলও যায় নি পেটে। ভবেনের বড় টেবিলটার কাছে দাঁড়িয়ে শরীরটা টলে যেতে চায় সুরবালার। গলা শুকিয়ে গেছে। কথা বলতেও যেন কষ্ট হয়। শুধু ধূপের থলিটা ও শক্ত করে চেপে ধরে হাতের মুঠোয়। ঠোঁট দুটো কাঁপে। গলা দিয়ে শব্দ বার হয় না।

মাথা তুলে স্থির দৃষ্টিতে তার-দিকে তাকিয়ে ভবেন বলে, বসুন।

কিন্তু অনেকক্ষণ বসতে পারে না সুরবালা। ভবেনের কথাটা যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দূর-দূর করে সকলেই। হাজার কাঁদুনিতেও গলে না। কাঠখোট্টা অফিসের ঝকঝকে একটা মানুষ সে। বাজে জিনিস গছিয়ে পয়সা খসাতে এসেছে জেনেও তাকে মোলায়েম সুরে বসতে বলে। সুরবালা কৃতার্থ হয়ে যায়।

বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

এক ঝাপটায় নিজকে সামলে নেয় সুরবালা। একটু শব্দ করে চেয়ার টেনে বসে পড়ে। দরদর করে ঘাম ঝরছে। ভিজে ছেঁড়া ব্লাউজ সেঁটে গেছে দেহের সঙ্গে। মাথার মধ্যে আগুনের ভারী চাপ। চটির মাথা-বের-করা পেরেকটা পায়ের তলায় জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। নিচু হয়ে একবার দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু না। পরে দেখলেও চলবে। আগে কাজের কথা।

ধূপ নেবেন? খুব ভাল চন্দন ধূপ?

ধূপ? হু-স করে সিগারেট টানে ভবেন, দিন।

উৎসাহী হয়ে থলির মধ্যে সুরবালা হাত ভরে দেয়, ক প্যাকেট দেব?

সুরবালার টানা-টানা চোখ দুটো দেখতে দেখতে ভবেন জিজ্ঞেস করে, কটা বিক্রি হলে এখান থেকে সোজা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন?

প্রশ্নের অর্থ সুরবালা বুঝতে পারে না। একটু উসখুস করে। মাথাটা ঠিক নেই তার! আসবার সময় মোড়ে একটা কচুরির দোকান দেখে এসেছে। যদি কিছু বেশি পয়সা পায় তাহলে শালপাতার ঠোঙাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়বে বড় গাছের কাছাকাছি একটা ছায়া-ছায়া জায়গায়। ক্ষিধেটা একটু না মারলে বাড়ি অবধি পৌঁছতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে তার। দু-চার প্যাকেট ধূপ এই অন্য ধরনের লোকটা কিনবে কি না সে বুঝতে পারে না।

ক প্যাকেট দেব?

ক প্যাকেট আছে? কাগজে খসখস করে কি লেখে ভবেন।

মুখ নামিয়ে থলির ভেতর ধূপের বাক্স গুণে গুণে সুরবালা বলে, তা দশ-এগারো হবে—

সব রেখে যান। কত দাম?

সব? কেমন বোকা-বোকা দৃষ্টি! মনে মনে হিসেব করে দাম বের করতে হাজার বার ভুল হয় সুরবালার। এমন খদ্দের আজকাল পাওয়া যায় নাকি সংসারে! ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনি গাইবার দরকার নেই। স্বামীর কর্কট রোগের কথাটাও জানাতে হয় না। এক কথায় থলি খালি করে ধূপ কিনে নিয়ে বুকের বোঝা হালকা করে দেয়। চলে আসবার সময় বার বার সুরবালা পিছন ফিরে তাকায়, মন সতেজ করে তোলে লোকটার তেজী চেহারা। মাথা-টাথা খারাপ নাকি! তা হোক। এমন মাথা খারাপ লোক দু-চারটে থাকলে তার ভাবনাটা রাতারাতি একেবারেই ঘুচে যায়।

হাতে পয়সা আসবার সঙ্গে সঙ্গে সুরবালার ক্ষিধেও যেন উবে মুছে যায়। খাবারের ঠোঙা হাতে গাছতলায় দাঁড়াতে লজ্জা করে। রোগা খিটখিটে নন্দর কথাও ভুলে যায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে ট্রাম-রাস্তার ধারে। চড়া রোদে চলতে কষ্ট হয় না। সেই অফিসটার দিকেই তাকিয়ে থাকে। একটার পর একটা ট্রাম যায়। সুরবালা নড়ে না।

পাগল-পাগল লোকটা! সাহেবের মত গায়ের রঙ। দয়ার শরীর। এবার যেদিন ঘুরে ঘুরে হাত-পা টন টন করবে তার— কবিরাজের বাড়ি গিয়ে নন্দর জন্যে পাঁচনের পুরিয়া কেনবার পয়সাও উঠবে না, সেদিন সে সোজা চলে আসবে এই অফিসের চার তলায়। বেশি কথা কিছু বলতে হবে না। একটা মুখের কথা। তার চোখের দিকে লোকটা শুধু একবার তাকাবে। ব্যস, থলি উজাড় করে সুরবালা ধূপ ঢেলে দিয়ে আসবে তার কাছে। হাসির আভায় তার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়। নন্দর দেখার ক্ষমতা নেই। ভুগে ভুগে তাকে কড়া কড়া কথা শোনাতেই জানে শুধু। তার চোখ দুটোর মিঠে স্বাদ রোগে-পোড়া মন পারে কেমন করে। তা না হয় না পেল কিন্তু দুটো মিষ্টি কথা শোনাতে ক্ষতি কি হয় লোকটার। তার জন্যে খেটে খেটে দেহ শুকিয়ে যায় সুরবালার। বুক টনটন করে সারা রাত, গা টেপবার ক্ষমতা নেই নন্দর। যুবতী মেয়েমানুষের ধর্ম বজায় রাখা কি সোজা কথা! অসুখ যখন হয়েছে তখন মুখ বুজে একদিকে পড়ে থাক। কিছুই দিতে না পারিস তো দুটো মিষ্টি কথা বলে তার দিন-রাতের সেবা-যত্নের দামটা অন্তত দে। তা না। শুধু গালাগাল। চেঁচামেচি। শক্তি থাকলে হয়তো নন্দ মেরেই বসত তাকে।

আর একটু সকাল-সকাল পাঁচন দিতে বড় কষ্ট হয় বুঝি?

কবিরাজ মশাই এখনই খাওয়াতে বলেছেন।

তোমার মাথা বলেছেন। এখন মানে?

এই সকাল ছটা সাড়ে ছটার সময়।

তোমার বাপের বাড়ির ঘড়ি আছে এ বাড়িতে? সকাল ছটা সাড়ে ছটা আবার কাল বাজবে। রোদের তেজ দেখতে পাও না বাইরে? সাতটা আটটা বাজে এখন।

এক-আধ ঘণ্টা দেরি হলে কিছু ক্ষতি হবে না গো।

না হবে না—তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছেন পেয়ারের কবরেজ মশাই। যত ক্ষতি হবে তোমার ধূপের থলি নিয়ে বার হতে এক মিনিট দেরি হলে—

সুরবালা হেসে বলে, চুপ করে শোও লক্ষ্মীটি। সকাল থেকে এমন মুখ ঝামটা দিতে নেই বউকে।

মুখঝামটা দেব না তো কি সোহাগ করব?

তা না হয় একটু করলেই। কে আর আছে আমাকে সোহাগ দেখাবার, বল?

ধূপের মালিক ওই মোটা রামুটা নেই? দিনরাত বাড়িতে এসে ডাকাডাকি। বিক্রির জন্যে ধূপ দিবি দে—ঘণ্টা ভোর অত কি গুজ-গুজ ফুসফুস রে বাপু!

একটু জোরেই হেসে ফেলে সুরবালা, রামবাবুকে তুমি চিনলে না—পয়সা ছাড়া মুখে কথা নেই। কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব বুঝে নেয়।

কি বলে না বলে তুমিই জান, পাশ ফিরে শোয় নন্দ। যন্ত্রণার একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে আসে মুখ থেকে। আপন মনেই গজগজ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ না। হঠাৎ কেমন গুম হয়ে যায়। যন্ত্রণায় চেহারাটা বদলে যায় যেন। ফ্যাকাশে রোগা একটা শরীর। দিনে দিনে বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কষ্ট করে উঠে দাঁড়ায় বটে কিন্তু তারপর অনেকক্ষণ আর নড়তে পারে না। গোঁ-গোঁ করে। সুরবালা কাছে থাকলে শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে চোখের জল ফেলে। যেন চিৎকার করবারও ক্ষমতা নেই আর।

এ-বাড়ি-ও-বাড়ি থেকে এঁকে-বেঁকে উনুনের ধোঁয়া ঘরে ঢুকে

নাকের জল চোখের জল ফেলায়। নন্দর মুখের সামনে হাত-পাখাটা এনে সুরবালা জোরে জোরে নাড়ে তখন। শীর্ণ দেহটার দিকে তাকিয়ে একটু একটু কাঁদে। চোখের জল ফেলবার এমন সুযোগ আর হয় না। নন্দ ভাবে, ধোঁয়াই কাঁদায় সুরবালাকে। তা না ভাবলে খোঁটা মারত। যেন তার জন্যে চোখের জল ফেলতেও ইচ্ছে করে না সুরবালার। যেন সে মরলে কত সুবিধা তার।

সব দিন সুরবালারও মেজাজ ভাল যায় না। আর কেউ নেই একটু সাহায্য করবার। টাকা না, একটু উৎসাহ, দুটো মিষ্টি কথা, একটু আশ্বাস—কোথা থেকেও কিছু আসে না। হাসপাতালে জায়গা হয় না নন্দর। তার চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরে।

দেখতে দেখতে মাথা ঠিক থাকে না সুরবালার। তখন রান্না-ঘরে উনুনে সে জোরে জোরে ফুঁ দেয়। হাত পিছলে পেতলের বাসন গড়ায় মাটিতে। পায়ে কয়লার গুঁড়ো ফোটে।

দিনের বেলাতেও ভ্যাপসা অন্ধকার। বিশ্রী একটা গন্ধ। বেপরোয়া সুরবালা তখন সতীত্ব ঘুচিয়ে এ জেলখানা থেকে মুক্তি চায়। সতীত্বের বদলে যদি নন্দ বেঁচে ওঠে তাহলে কার কি ক্ষতি? নন্দ এমনিতেও তাকে ছোঁয় না। অমনিতেও না। তার কি এসে যায়? কেউ যদি তার গরম মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে, তাপ জুড়িয়ে দিয়ে দেহ হিম হয়ে যাওয়া তৃপ্তির স্বাদ দেয়—আর হাজার হলেও সে তো মেয়েমানুষ—দেহের অহঙ্কার মনের মধ্যে মাথা বাড়ালে সে কি অসতী? দাম একটা চাই বইকি তার।

বেচারা নন্দ। লোকটা ধুঁকে ধুঁকে মরে। সুরবালার খাঁ খাঁ করা বুকের খবর রাখার শক্তিই তো নেই তার। একটু লাফালাফি করলে হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই মরে যাবে। হাঁপাবে। মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে। ব্যস, তারপর সব শেষ।

অদ্ভুত যন্ত্রণায় জ্বলতে জ্বলতে নিজের দাম পাবার জন্যে ছটফট

করে সুরবালা। অভাবের বেড়ি আর নন্দর হাঁসফাঁস গোঙানি ছাড়িয়ে যায় তার মনের ধিক-ধিক জ্বালা।

তা কে দাম দেবে? ধূপের দাম দিতেই সাতবার ভাবে শুকনো মানুষগুলো তো সুরবালার পোড়া প্রাণের দাম। ভাল করে খেতে না পেলে হবে কি, দাবি একটা আছে বইকি তার দেহের। বয়সটা তো আর রাতারাতি সে বাড়িয়ে দিতে পারে না। বুকভাঙা দীর্ঘ-নিশ্বাসটা ঠেকাতে পারে না কি ধূপের থলির বাড়ি মেরে? জ্বলে যায় বটে কিন্তু মিঠে গন্ধ ছাড়বার সুযোগ পায় কই রোদে-পোড়া জলে-ভেজা তাজা একটা দেহ। ধূপকাঠি ঘরে নিয়ে পুড়িয়ে ঘ্রাণের তৃপ্তি পাবার জন্যে যেমন করে সাধাসাধি করে দোরে দোরে ঘোরে, তেমন করে যৌবন নিয়ে তো আর কাঙালপনা করতে পারে না এর কাছে তার কাছে? কার ঘরে গিয়ে নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গন্ধ বিলোবে মুনাফায় ফেঁপে-ওঠা রাম মালিকের সুগন্ধ ধূপের মত? চিনির বলদ তো নয়—মেয়েমানুষ সে। বলদের বদলে চট করে নিজের একটা উপমা হঠাৎ খুঁজে পায় না সুরবালা।

নন্দর মত বিছানায় পড়ে তার কাতরাতে ইচ্ছে করে। চিৎকার করতে পারলে যন্ত্রণা খানিক কমবে তো বটে। কিন্তু তার জ্বালার প্রকাশ করতে গেলেই তো বাধবে গণ্ডগোল। সতীত্বের ভরা ঝুড়ি শিকে ছিঁড়ে ঝুপ করে মাটিতে পড়বে। নন্দর মাথা খারাপ হবে তখন। পাড়ার লোক ঢিল মারবে। কাজেই জ্বালাটা সুরবালার একারই থাক। জাহির করে কাজ নেই।

পারলে এক্ষুনি সে নস্তি পিসির মত বুড়ি হয়ে যেত। তোবড়ান গাল। চুপসে-যাওয়া শরীর। ঢিলে-ঢালা গায়ের চামড়া। পাগল-করা যন্ত্রণা বাসা বাঁধতে পারবে না মনের ভেতর। কোন সবল পুরুষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে জ্বলতে ইচ্ছে করবে কিনা কে জানে তখন! কী সুখী রে বাপু নস্তি-পিসি!

ড্যালহৌসী স্কোয়ারে এখন রোদের তাপ বেশি। ঘর বাড়ি গাছ

গাড়ি প্রাণ-ফাটা রোদে পুড়ছে। আকাশ-ভাঙা শ্রাবণের ভিজে ভারী মেঘ কবে ভেলা ভাসাবে মাথার ওপর। ভয়ে কাক পালাবে। আর বন-বাদাড়ে পেখম তুলে নাচবে বড় বড় ময়ূর। শহরে এলে গাড়ি-ঘোড়ার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে রসের ময়ূর। ব্যাথার চোটে চুপসে যাবে সুরবালার মত।

পুকুরের জল কতটা গরম হল। শুকিয়ে শুকিয়ে তলানিতে ঠেকেছে। খটখটে মাটি বেরিয়ে পড়ল বলে। তার আগে একবার বৃষ্টি দিয়ো ভগবান! শুকনো চোখ দুটো কটকট করে সুরবালার। হ্যাঁ নামবে। বৃষ্টি নামবে। নামবেই। তখন সে নিজেও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আর দেরি কত বর্ষার? হঠাৎ বাতাসের নরম-নরম ছোঁয়া গায়ে যেন মাখামাখি করে। চলার গতি ঢিলে হয়ে যায় সুরবালার। ছায়ায়-ছায়ায় সে এগোয়। বুক চিরে তেষ্টা পায়। জলের না চায়ের?

কাজ তার আর বাকি নেই। ধূপের থলি হাতের মুঠোয় গুটিয়ে নিয়েছে সে। সব শেষ। নতুন একটা অফিসে গিয়েছিল আজ প্রথম। স্বামীর কর্কট রোগের কথা বলতেই সহানুভূতির বন্যা ছোটে যেন। পটাপট প্যাকেট শেষ।

ভারী আঁচল এখন সুরবালার। হেলেদুলে বাড়ি ফিরে গেলেই হয়। বিকেল বেলা হিসেব পেয়ে রামু মহাজনের গোমড়া মুখে হাসি ফুটে উঠবে। তার মত এমন কাজের মেয়ে আর কে? কিন্তু বাড়ি ফিরে যেতে মন চায় না এখন। ভ্যাপসা গরমে স্বামীর ক্যাচক্যাচি শুনে কি লাভ। আর ঘুম? ঘুমোতে কে চায়। ঘুম আসে নাকি অত সহজে সুরবালার? তার চেয়ে তাজা সেই মানুষটাকে দেখবে। চোখে চোখ রেখে দুটো কথা বলবে। আর খেলিয়ে খেলিয়ে চুমুক দেবে গরম কাপে।

ধূপ বেচতে যাওয়া তো নয় তার আজ। রূপ দেখতে যাওয়া।

দেখাতেও। গন্ধে-গন্ধে মন ভরুক দুজনের। সুরবালা এগোয় এঁকে-বেঁকে। ভিজে কাপড়ে কলসী কাঁখে যৌবন-ভরপুর স্বামী-সোহাগিনী পাকা একটা বউয়ের মত। ভবেন বাবু না কি যেন নাম। যা হোক। দাম তো দেয় বটে তাকে চোখে-চোখে।

নিজেকে আর একবার যাচাই করতেই আস্তে আস্তে সুরবালা চারতলায় ওঠে। চার কেন—অনেক—অনেক ওপরে। বোধহয় একেবারে শূন্যে। কে জানে! মেঘ কোথায় আকাশে। আছে। দেখতে না পেলেও সে জানে এত বড় আকাশের কোথাও মেঘ ঠিক লুকিয়ে আছে। আছেই।

একটু অবাক হয়ে মাথা তোলে ভবেন। ভাবটা, এই সেদিন তো এলে আবার আজ কেন? অত ঘন ঘন থলিসুদ্ধ ধূপ কিনলে চলে না কি? আর বাকি জিনিস কেনা-কাটা নেই?

প্রথমেই গুটনো থলি হাসিমুখে টেবিলের ওপর রাখে সুরবালা। চুপচাপ থেকেই ভবেনকে বুঝিয়ে দেয়, আজ ধূপ বেচতে আসি নি গো। তোমাকে দেখতে এসেছি। নিজেকে দেখাতেও এসেছি, দেখ, দেখাও।

বসুন।

আজ ধূপ নেই।

তবে?

অমনি এসেছি। রোজই তো দরকারে আসি। বিনা দরকারে একদিন আসা তো চাই, সুরবালার স্বরটা ভিজে-ভিজে শোনায়, খালি দরকারে এলে কি ভাবে মানুষ। ভাবে কি না বলুন?

ডান হাতে খোলা কলম। বাঁ হাত গালে। গলার বোতাম খোলা। সামনে একরাশ সবুজ নীল হলদে ফাইল। আর পাখার গরম হাওয়া। রুমাল বের করে ভবেন মুখ ঘষে। সুরবালাকে আগাগোড়া দেখে। বেয়ারাকে চা আনতে বলে দু কাপ।

আর কিছু খাবেন?

না, না, দেহ ঝাঁকায় সুরবালা, এত লোকের সামনে খাই না।

ভবেন হাসে, আপনার স্বামী কেমন আছেন?

ওই একরকম, হাই তুলে ছাড়া-ছাড়া উত্তর দেয় সুরবালা, ও রুগীর আবার থাকাথাকি কি?

আজকাল সব অসুখই তো সারে।

সুরবালা হেসে বলে, না, সারে না।

জোর দিয়ে কথা বলে ভবেন, সারেই, ধৈর্য্য ধরুন, দেখুন আমার কথা ঠিক কি না।

ও নিয়ে ভাবি না, ছেঁড়া চটি মেঝেতে ঠুকে ঠুকে সুরবালা বলে, যারা দয়া করে তাদের কথা ভাবি—

দয়া কেন বলছেন? বিব্রত হয়ে ভবেন বলে, জিনিস দিয়ে দাম নেন। এতে দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ওঠে কোথায়!

ওঠে, ওঠে, মুচকি-মুচকি হাসে সুরবালা, দয়া না থাকলে অত ধূপ কি আর কেনেন আপনি?

ওটা তো আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

ওই হল, সুরবালা পাখির মত কথা বলে, ওরই নাম দয়া। আপনাদের দয়ার শরীর।

সিগারেট ধরিয়ে ভবেন হাসে, তাই বুঝি আপনিও দয়া করে বিনা দরকারে এলেন?

আপনাকে দয়া দেখাবার ক্ষমতা আছে না কি আমার? ছি! ছি!

কে জানে থাকতেও পারে!

অনেক জোড়া চোখ। এদিক-ওদিক থেকে হাসির তোড়। আর ভাল না। এমন হলে ধূপ নিয়েও সুরবালার আসতে লজ্জা করবে এখানে। এটা কি প্রাণের কথা বলবার জায়গা? অফিস শুদ্ধ লোকের মাঝে একটা কেলেঙ্কারির কথা না ছড়ায় ভবেনের নামে। হঠাৎ সুরবালার সে কথাটা খেয়াল হয়। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে ও উঠে দাঁড়ায়।

বেলা কত হল? বারোটা-একটা। জানলার মরচেধরা শিকের ফাঁকে মুখ ঠেলে সুরবালা বাইরে তাকায়। চড়চড়ে রোদ। সকাল দশটায় যেমন দুপুর একটায়ও তেমন। সময় বোঝা ভার। আড়-চোখে সে বার বার তাকায় নন্দর দিকে। ঘুমোল কি না। অল্প দাম দিয়ে ছোট একটা আতরের শিশি কিনেছে কাল। গায়ে ঢালবার সাহস নেই এখন। টের পেলেই গলা ফাটাবে নন্দ। চরিত্রের খোঁটা দিয়ে গায়ে ফোস্কা পড়াবে। যেন কোনও সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই সুরবালার? নিজে আকাশ দেখতে পায় না, চোখ-ধাঁধানো আলোয় চলাফেরা করতে পারে না বলে বোধ হয় তার যত রাগ। তাই যত দোষ সুরবালার। একটা সুস্থ সবল মানুষকে সারা দিন-রাত কেমন করে সহ্য করবে দিন-ফুরিয়ে-আসা নন্দ।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। পা টিপে টিপে সুরবালা এগিয়ে আসে দেওয়ালে ঝোলানো ছোট ভাঙা টিনের আয়নাটার কাছে। হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরা ছোট শিশিটা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছিপি খোলে। গলার কাছে মাখায়। ভুর ভুর গন্ধ। অনেক দিন পর হঠাৎ ঘুম পায় যেন সুরবালার। আর পাশ ফিরে তখন নন্দ পিটপিট করে তাকায় এদিকে। আশ্চর্য! এখনও ঘুমোয় নি লোকটা! মরে যাবে দুদিন পরে কিন্তু চোখ দুটো আজও হিংসেয় জ্বলে ওঠে।

বলি, অত সাজের ঘটা কেন? ধূপ বেচার সময় খদ্দেরের মন ভোলাবার কায়দা নাকি?

কথা শুনে মেজাজ তেতে ওঠে সুরবালার। যত অভাব তো নন্দর জন্যেই। সেটা বুঝেও লোকটা ন্যাকা সেজে থাকে কেন? অভাবে আর গরমে মাথা খারাপ হয়ে যায়। এ ঘরের চেয়ে রাস্তা অনেক ভাল। মাথার কাঁটা দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁদুরের দাগ টানে সে। এখন বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বেঁচে যায়। ক্যাটক্যাটে কথা আর কাঁহাতক শোনা যায় দিনের পর দিন?

যেন জেরা করে নন্দ, কখন ফেরা হবে শুনি?

কেমন করে বলব? টেনে টেনে সুরবালা শাড়ি ঠিক করে। তাকায় না নন্দর দিকে।

বলতে পার না মানে? পাঁচটার পরে খোলা থাকে নাকি আফিস-কাছারি? রাত করে বাড়ি ফেরার ফিকির—

সাত সকালে বাড়ি ফিরে করব কি? তোমাকে ওষুধ গেলানো ছাড়া আমার আর কাজ নেই?

তা যাও না, ঠোঁট চেপে চেপে নন্দ বলে, একেবারে বাজারে বসে কর না যত কাজ—

করবই তো। তোমার মত একটা প্যাকাটির খোঁচা খেয়ে দিন কাটবে নাকি আমার? তেতে-পুড়ে রোদে ঘুরি একটা পশুর—

কি—কি বললে? আমি পশু?

নয় তো কী? পশু না হলে আমাকে তিল তিল করে পুড়িয়ে মার? একটু লজ্জা করে না তোমার? ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই। পশুই তো।

চোখ বড় হয়ে যায় নন্দর। ফেনা ওঠে মুখ দিয়ে। লাল মুখ। হাঁপায়। হাতের সামনে বালিশ পেয়ে ছুঁড়ে মারে সুরবালাকে, দূর হয়ে যাও সুমুখ থেকে! তোমার মুখ দেখাও পাপ। কে খেতে চায় পাপের পয়সার ওষুধ। বেশ্যা কোথাকার!

উঃ, মুরদ কত আমার জানা আছে। হ্যাঁ, একশোবার আমি বেশ্যা। আর তুমি কি! তোমার জন্যেই না আমার অভাব। মরণও হয় না এমন অথর্ব অমানুষ স্বামীর—

আতরের শিশিটা মেঝেতে আছড়ে ভেঙে ফেলে সুরবালা। খুব হয়েছে। মধুর গন্ধে আর কাজ নেই। পোড়া মনে কিছু যায় না। ধূপের থলিটা হাতে নিয়ে শব্দ করে সে দরজা খোলে। ইচ্ছে করে জলের গেলাস রাখে না নন্দর মাথার কাছে। মরুক, লোকটা। বাড়ি ফিরে তার কথা যেন আর না শুনতে হয় সুরবালাকে।' রাগের মাথায় ঘষে ঘষে পা দিয়ে চটি টেনে নেয়। ছুটে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। গলা

সপ্তমে তোলে তখন নন্দ। সুরবালার চোদ্দ-পুরুষকে টেনে কাদায় বসায়। কান ভোঁ-ভোঁ করে সুরবালার। একটা বর্ণও বুঝি কানে যায় না।

গুরু-গুরু মেঘের ডাক। ঠাণ্ডা হাওয়া বয়। রোদের তেজ শুকিয়ে যায় সুরবালা ডালহৌসী স্কোয়ারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই। লম্বা লম্বা বিদ্যুৎ থেকে থেকে ঝলসে ওঠে চকচকে পাতলা মেঘের গা চিরে। এখুনি ঠিক জল নামবে। নামুক। ভালই তো হয়। তাহলে অনেকক্ষণ বসতে পারবে চারতলায়। অনেক মিষ্টি কথা শুনবে ভবেনের মুখ থেকে। ঝমঝম জলের জন্যে আটকে গিয়ে যদি দুদণ্ড বেশি কথা বলে তেজী লোকটার সঙ্গে তাহলে কার কি বলবার থাকবে? হাসাহাসি করবার কারণ খুঁজে পাবে না রসিক বাবুরা। নামুক না জল।

কিন্তু চারতলায় আর উঠতে হয় না ধৈর্য ধরে। কারুর বিদ্রূপের বাণও খেতে হয় না। তাকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে কাছে এগিয়ে আসে ভবেন, একি, এখন এদিকে? ভরা ধূপের থলিটার দিকে সে তাকায়।

থলিটা লুকোবার চেষ্টা করে সুরবালা। যেন আজও দেখা করতে এসেছিল ভবেনের সঙ্গে বিনা দরকারেই। হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করে, আজ অফিস নেই?

এইমাত্র ছুটি হয়ে গেল।

ছুটি? মুখ তুলে সুরবালা জিজ্ঞেস করে, ছুটি কিসের?

বাঃ, শনিবার না আজ?

আরে, তাই তো, কথাটা যেন এতক্ষণ পর খেয়াল হয় সুরবালার। মুখে আর কিছু বলে না। মনে মনে বলে, অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত! তার কাছে সব বারই সমান।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামে ভবেন। চলে যায় না। ভরা ট্রাম।

ভরা থাস। রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক। ঘরে ফেরবার তাগিদে অসহিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যা হোক একটা ধরবার আশায়। ওঠা যায় নাকি এখন? হাত-পা ভাঙব, ধূপের ভরা থলি চুপসে যাবে। যায় যাক। ভবেনকে দেখিয়ে ওটা ময়লা ফেলবার গোল জায়গাটায় ফেলে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করে সুরবালার। বেচাকেনার কারবার নেই এখন।

কেমন করে ফিরবেন? দরদ দেখিয়ে ভবেন বলে।

কে জানে, বিড়বিড় করে সুরবালা, তাড়া কি। ভিড় কমলে আস্তে আস্তে এক সময় ফিরলেই হল।

চা খাবেন? সুরবালার কথার ঢঙে কি একটা ইঙ্গিত বুঝি পায় ভবেন, চলুন না আমার বাড়িটা দেখে যাবেন। ছুটির দিনেও ধূপ নিয়ে যেতে পারবেন তাহলে—

না না, ধূপ নিয়ে কেন, অমনি যাব, জ্বলজ্বলে আভা এক কথায় ছড়িয়ে যায় সুরবালার উপোসী গালে। বাড়িতে কত লোক ভবেনের। একটা ফাঁকা জায়গা আছে তো। প্রাণ খুলে কথা বলবার নিরিবিলি একটা ছাদ কিম্বা খালি একটা ঘর। যেখানে আর কেউ দেখবে না তাদের। বুক তোলপাড় করে সুরবালার। জোর গলায় ছোট একটা ট্যাক্সি ডাকে ভবেন। দরজা খুলে হেসে বলে, উঠুন।

তাকে দেখে এমন মিষ্টি করে হাসে আর কে! চোখ ছলছল করে ওঠে সুরবালার। ভরা মন নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠে। আর কবে মোটর গাড়িতে উঠেছে মনে নেই। অনেক দিন আগে বোধ হয় রামুর কাছ থেকে কটা টাকা আগাম নিয়ে নন্দকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল ট্যাক্সিতে। বাপ রে! দুটাকা তিন টাকা ভাড়া। সেদিন ট্যাক্সি চড়ে কোন আনন্দ পায় নি সুরবালা।

কিন্তু আজ? হর্ন বাজছে ঘন ঘন। চমকে লোক সরে যাচ্ছে। টানা লম্বা রাস্তা। পথ ফুরিয়ে যায় দেখতে দেখতে। ক টাকা ভাড়া উঠবে? ভবেনের বাড়ি কত দূর? যত দূরই হোক, যেখানেই হোক,

মনটা ভরে ওঠে সুরবালার। একটা জীবনের জন্যে আর একটা জীবন শুকনো খটখটে করে তোলার বিধান দেয় কোন সতীত্ব? সতীত্বের মাথায় লাথি। বেশ্যা বলে গাল খাবে কেন শুধু শুধু। প্রাণটা জুড়োক। দেহ ঠাণ্ডা হোক। স্বর্গের সিঁড়ি দেখাক সুস্থ-সবল ভবেন।

এই যে, এখানেই, কালীঘাট পার্কের কাছে তেতলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামে।

সুরবালা ভবেনের পেছন পেছন উগ্র একটা নেশায় বিভোর হয়ে উঠে আসে দোতলায়। আলোর রেখায় চকমক করছে সিঁড়ি। থলির চাপে হাতের তালু ঘামে। ব্যবসার চিহ্নটা যেন এ সময় ঘন ঘন কাঁটা ফোটায়। এটা গাড়িতে ফেলে এলেই হত।

চাবি ঘুরিয়ে একটা ঘর খুলে সুরবালাকে ভেতরে নিয়ে আসে ভাবেন, কেউ কোথাও নেই। একেবারে চুপচাপ। খাট আর আলমারি। বই আর টেবিল। লোকটার তিন কুলে আর কেউ নেই নাকি? অবাক লাগে সুরবালার।

বসুন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে খাটের ওপরেই বসে পড়ে সুরবালা। ধূপের থলি রাখে খাটের নিচে। ভবেনের দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করে, আর কেউ নেই আপনার?

কেউ না।

বাঃ, তাহলে চলে কেমন করে?

ছাইদানে টিপে টিপে সিগারেট নিবিয়ে ফেলে খাটের একদিকে বসে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে ভবেন বলে, চলে না।

যেমন জায়গা চেয়েছিল ঠিক তেমন। যেমন মানুষ চেয়েছিল ঠিক তেমন। ঘন ঘন আসবে এখানে সুরবালা। একটা কথা বলার কেউ নেই। কেলেঙ্কারির ভয় নেই। মানুষটাও দেখছে তাকে। এ দেখার অর্থ বোঝে সে। দেখুক। দেখবার জন্যেই তো আসা। মুখ নামিয়ে নখ খোঁটে সুরবালা। শরীরে কি যেন একটা চনমন

করে ওঠে। রামুর দোকানের সুইচে হঠাৎ হাত লাগলে যেমন মনে হয় তেমন। কথা বলে ভবেন আর একটু একটু করে সরে-সরে আসে। আসুক না।

ঘুমের কোন ওষুধ বুঝি দিয়েছিল ভবেন? এত ঘুম কোথা থেকে আসবে সুরবালার পোড়া চোখে! মধুর একটা ক্লান্তি। তৃপ্তির গভীর একটা স্বাদ। কত রাত হল! রাস্তার আলো জ্বলছে। ঘরে অন্ধকার। ভবেনের গরম নিশ্বাস। সুরবালা তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

কটা বাজে? লজ্জায় জড়োসড়ো ভাঙা গলার স্বর।

খাট থেকে নেমে টিক করে আলো জ্বেলে ভবেন বলে, ঠিক আটটা—

আঃ, আলো নেবান শিগগির। ঘরের বাইরে যান একটু। কেমন অসভ্য মানুষ আপনি!

ভবেনের হাতের টোকায় সুইচটা আবার টিক শব্দ করে। আবছা অন্ধকারে হাসে ভবেন, চা খাবে?

না জল। গেলাস গেলাস জল। আঃ, আগে বাইরে যান না একটু—

এক সময় নিজেই আলো জ্বালায় সুরবালা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে। তারপর ভেজানো দরজা ফাঁক করে ইশারায় ভবেনকে ঘরে ডাকে। এবার যেতে হবে। যা চটিয়ে দিয়ে এসেছে নন্দকে! এতক্ষণ বেঁচে আছে কি না কে জানে!

বাড়ি যাব।

বাঃ, চা খাবে না?

জল তো খেলাম। আর একদিন এসে চা খাব! আর রাত করবো না।

ঠিক আসবে?

মিছে কথা বলি না আমি, নিচু হয়ে ধূপের ভারী থলিটা সুরবালা খাটের তলা থেকে তুলে নেয়।

ও হো, উৎসাহী হয়ে ভবেন জিজ্ঞেস করে, ক প্যাকেট ধূপ আছে ওখানে আজ?

কে জানে!

দেখি দেখি, ভবেন নিজেই থলি উপুড় করে সব ধূপ ঢালে টেবিলের ওপর, কই বেশি তো নেই আজ?

অনেক আছে, হাত বাড়িয়ে প্যাকেটগুলো দূরে ঠেলে দিয়ে সুরবালা বলে, থাক থাক, ওসবে আজ আর কাজ নেই।

কাজ থাকবে না কেন? সময় নষ্ট হল না এখানে? দামের কথা আজ জিজ্ঞেস করবে না ভবেন? দেরাজ খুলে একটা দশ টাকার নোট বের করে। মুখে হাসি ফুটিয়ে সুরবালার সামনে মেলে ধরে বলে, এই যে দাম।

সুরবালাকে তার এতদিনের ভাবনা-করা দাম শেষ অবধি দেয় বটে ভবেন। কিন্তু দাম আজ নেয় না সুরবালা। চোখ কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে যায় মুখ। বিস্বাদের গ্লানি শরীরের খাঁজ ভেঙে ভেঙে টনটন করে উঠে। যেন অশুচি মেয়েমানুষ একটা! বাড়ি থেকে বেরোবার আগে নন্দর বলা কথাটা মনে পড়ে যায়।

কী হল? তার ভাবান্তর লক্ষ্য না করে জিজ্ঞেস করে ভবেন।

জবাব দেয় না সুরবালা। ঝাপটা মেরে নোটটা ছিনিয়ে নেয় ভবেনের হাত থেকে। তুমড়ে মুচড়ে থলির মধ্যে ভরে। তারপর নোটসুদ্ধ থলি ভবেনের মুখের ওপর ছুঁড়ে মেরে হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে যায় সিঁড়ি ভেঙে। বাজ-পড়া গাছের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ভবেন।

রাস্তায় পড়ে সুরবালা দুই হাতে শক্ত করে নিজের মাথাটা চেপে ধরে মনে মনে ঠাহর করবার চেষ্টা করে এখান থেকে গঙ্গা কতদূর। দুটো ডুব দিয়ে আসতে না পারলে শরীরটা বুঝি জ্বলে যাবে।

হঠাৎ একটা উন্মাদ মেয়ের মত সে ছুটতে আরম্ভ করে। গঙ্গার দিকে নয়। নিজের বাড়ির দিকে। যেখানে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে একটা লোক—যেখানে এখনও পড়ে আছে আতরের ভাঙা শিশি আর যেখানে সুরবালার কোন দাম ঠিক করা নেই!

২৬শে সেপ্টেম্বর : ১৯৫৯

শনিবার দুপুর : কলিকাতা

॥ প্রতিবন্ধ ॥

আর একটু পরে সামনের বাড়ির সেকেলে মোটরটা ধুঁকতে ধুঁকতে এসে দাঁড়াবে। কয়েকটা কর্কশ হর্ন বাজাবে পর পর। একটু শব্দ করেই ছোকরা চাকরটা দরজা খুলে দেবে। - তারপর সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ। সেই আধবুড়ো ভদ্রলোক আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাবে।

রাত ঠিক সাড়ে দশটা। কল্পনার জানলার কাছে এসে দাঁড়াবার সময়। শাড়িতে হলুদের দাগ। হাতে সরু সরু চুড়ি। কপালে অল্প অল্প ঘাম। ভিজে-ভিজে চোখ। আর সারাদিন সংসারের খুটিনাটি সামলে ছোট একটা ঘরে ছটফট করার উৎকট ক্লান্তি সমস্ত শরীরে। নীতীশ ফিরবে এখন।

বৃষ্টি একটু ধরে এসেছে। হাওয়ার জোর আছে এখনও। বাইরে ঝিরঝির একটানা শব্দ। রাস্তা ফাঁকা। একটা লোকও নেই। ডাস্টবিনের পাশে সারাদিন শুয়ে থাকা রোগা কুকুরটা জলের ভয়ে কার বারান্দায় গিয়ে উঠেছে কে জানে। জানলার সস্তা দরের ছিটের পর্দাটা ভিজে সপসপ করে। হাওয়ার ঝাপটায় থেকে থেকে ওঠে নামে। আর একা ঘরের মধ্যে ছটফট করতে করতে চমকে ওঠে কল্পনা। কেউ কোথাও নেই।

কোন সকালে বেরিয়ে যায় নীতীশ। জলে ঝড়ে, শীতে গ্রীষ্মে রোজ। নিয়মের এদিক-ওদিক হয় না। মনের মধ্যে হিংস্র ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠলেও রোজকার বাঁধা কঠিন ছকটা উল্টে দিতে পারে না কল্পনা। ঠিকে ঝি যখন নীতীশের এঁটো থালা-গেলাস তোলবার জন্যে হুমড়ে যাওয়া শরীরটা একটু ভাঙে তখন সে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রামে উঠে বসেছে। কোন কথা নেই মুখে। মাঝপথে অল্পবয়সী ছাত্রের বাড়িতে নামতে হবে। সেখান থেকে সটান অফিস।

শনিবার ছাড়া অফিসের পর আর একদিনও সোজা বাড়ি ফিরে আসতে পারে না নীতীশ। চৌরঙ্গি আর এসপ্লানেডে যখন হু হু হাওয়া আর আকাশ চিরে-চিরে আলোর রেখা ঝলসে ওঠে পুরনো গাছের পাতায় আর ময়দানের তাজা সবুজ ঘাসে, তখন হঠাৎ এক সময় সে বোবা একটা পশুর মত মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকায়। শুধু অজস্র মানুষের ভিড় আর হোটেলে রেস্তোরাঁয় কিংবা প্রেক্ষাগৃহের দরজায় ধারালো তলোয়ারের মত ঝকঝক করে জীবন।

দৃষ্টি মুহূর্তে ফিরে আসে নীতীশের। ট্রামে ওঠবার চেষ্টায় ঠোকাঠুকি হয় অনেক মানুষের সঙ্গে। শরীরে কখনও দরদর ঘাম—কখনও বৃষ্টির জল। হয় শার্টের হাতা ফেঁসে যায়, নয় চটির স্ট্র্যাপ ছেঁড়ে। তারপর আরও দুজন ছাত্রের সঙ্গে তিন-চার ঘণ্টা গলা ফাটিয়ে আবার যখন সে রাস্তায় নামে তখন চাঁদের আলো থাকলেও চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। ভারী একটা ইঁটে ধাক্কা খেয়ে বুড়ো আঙুলটা টনটন করে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ হাঁপায়।

এরপর মাঝে মাঝে আরও বাকি থাকে। মাসের শেষে চেনা, আধ-চেনা লোকের কাছে বিরস মুখে টাকা ধার করতে যাওয়া। সব সেরে যখন বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছায় নীতীশ, তখন রাতটাও যেন ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করে। পুকুরের ধারে নিমগাছটা স্থির হয়ে থাকে। মিষ্টির দোকানের বন্ধ ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে একটু একটু আলো দেখা যায়। আর কুকুরটা চিৎকার করতে করতে তাকে পথ ছেড়ে দেয়। রোজকার মত আশেপাশের রূপটা একরকমই থাকে—শুধু নীতীশের কোন দিকে চোখ তুলে তাকাবার মত মনের অবস্থা থাকে না। ক্লান্ত শীর্ণ একটা মূর্তি কোনরকমে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিতে পারলে যেন বেঁচে যায়।

কল্পনা নীতীশকে দেখে দিনের পর দিন। একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া রুগ্ন একটা শরীর। ভাবনায় আর ক্লান্তিতে জিভটা যেন অসাড়। মুখে কথা আসে না। একটা ঠাণ্ডা ঝাপটায় কল্পনাও পিছিয়ে আসে।

বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। আধ-ঘুমন্ত লোকটার মুখে আলৌকিক একটা কিছু করে হাসি ফোটাতে চায়।

তাই মাঝে মাঝে কল্পনা এসে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। বিয়ের সময় পাওয়া অল্প দামের নিষ্প্রভ একটা আয়না। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে মুখ অস্পষ্ট হয়ে যায়। অদ্ভুত দেখায়। আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে হাসি আসে তার। আর নিজের আসল রূপটা দেখবার জন্যে সে তাড়াতাড়ি একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায়।

হয়তো নিঃঝুম লম্বা একটা দুপুর ট্রাম রাস্তার ধারে বটগাছটার মত ঝিমোয়। যাই-যাই করেও যায় না। বাইরে কড়া রোদের দাপট। টেনে টেনে ফেরিওলা ডেকে যাচ্ছে। কখনও বাসনের শব্দ হচ্ছে ঠং ঠং। কখনও ঝুমঝুমি বাজছে ঝুমুর ঝুমুর। কল্পনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে যাচাই করে।

শরীরটা শুকিয়ে গিয়েছে। চোখ দুটোর যেন ভাষা নেই। শিথিল দুটো গাল। কিন্তু না থাক মুখের জৌলুস, পায়ের জোর বোধ হয় এখনও ঠিক তেমনি আছে। মাটিতে পা ঠুকে দুপদুপ শব্দ করে সে। অনেকদিনের অনভ্যাস, হয়তো বেশিক্ষণ দম থাকবে না। কিন্তু একটু একটু করে অভ্যাস করলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন নীতীশ রাজি হলে হয়।

শাড়ি তুলে নিজের পা দুটো টিপে টিপে দেখে কল্পনা। আর কিশোরী জীবনের কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে যায়। ছোট্ট একটা চঞ্চল শরীর। তরল বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতি। বাজনার তালে তালে মঞ্চের এদিক থেকে ওদিকে যেত হরিণীর মত।

কিন্তু যতই অভাব থাক সংসারে, শাশুড়ীর টাকা পাঠান হোক বা নাই হোক, মাইনের তাগাদায় ঠিকে-ঝি মুখভার করুক দিনের পর দিন, চেহারাটা বুড়িয়ে যাক নীতীশের, হু হু করে পাকুক মাথার চুল—কল্পনা জানে যে সে যদি নাচের ইস্কুলে অল্পক্ষণের কাজটা নিয়ে কিছু রোজগারের কথা তোলে তাহলে চমকে উঠবে নীতীশ। চোখ দুটো

থরোথরো বিস্ময়ে অন্যরকম হয়ে যাবে। খকখক করে, কাশবে জোর করে শীর্ণ মুখে হাসি টেনে বলবে, 'পাগল নাকি।' তারপর পাশ ফিরে পড়ে থাকবে মড়ার মত। ঘুমোবে না। টাকার ভাবনায় নির্জীব হয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে তার দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনে কল্পনা মনের মধ্যে সান্ত্বনার ভাষা হাতড়ে ফিরবে।

তখন ইঁদুরের বাচ্চাটা কিচকিচ করে এখান থেকে ওখানে ছুটে বেড়াবে। আয়নার উপর একটা আরসোলা খরর্ খরর্ করবে। রাস্তার কুকুরগুলো হঠাৎ আরও জোরে ডেকে উঠবে। টং টং করে রঙের নতুন কারখানায় রাত বারোটার ঘণ্টা বাজবে।

জানলার কাছ থেকে সরে আসে কল্পনা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কাদা টপকে-টপকে আসছে নীতীশ। এ-সময় এ-পাড়ার আর কেউ ফেরে না। পায়ের শব্দ কল্পনা চিনতে পারে। খুট করে মাত্র একবার ক্লান্ত হাতে কড়া নাড়ে নীতীশ। রাস্তার আলো হঠাৎ ম্লান হয়ে এসেছে। চিমনিতে দপদপ করছে লালচে একটা রঙ।

নীতীশের চেহারা দেখে রাগ হয়ে যায় কল্পনার। ভিজে কুঁকড়ে গেছে লোকটা। আধ-ময়লা পাঞ্জাবিটা সেঁটে গিয়েছে ফুটো ফুটো গেঞ্জির সঙ্গে। চুল থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। যদি অসুখে পড়ে তাহলে তার চোখের সামনে বিনা চিকিৎসায় হাঁপাতে হাঁপাতে মরবে একটা লোক। তাকেও মারবে।

ঝাঁজে কর্কশ হয়ে ওঠে কল্পনার গলার স্বর, কী আশ্চর্য। এমন করে ভিজে আসতে হয়? ছি, ছি, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?

ভিজে রুমাল কাঁধের কাছে একবার বুলিয়ে নিয়ে অসহায়ের মত হাসে নীতীশ, ট্রাম থেকে নামতেই জোরে জোরে জলটাও এল—

কে তোমাকে নামতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল শুনি? বুদ্ধি করে আর একটু এগিয়ে যেতে পারলে না?

এত রাত হয়ে গেছে, ভিজে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নীতীশ বলে, আর কতক্ষণ না খেয়ে বসে থাকবে তুমি?

রাতই যখন হয়েছে তখন না-হয় আর একটু হতো, গজগজ করতে করতে একটা গামছা তাড়াতাড়ি নীতীশের হাতে দিয়ে কল্পনা বলে, শিগগির ভাল করে মাথা মুছে কাপড় বদলে নাও—আমি দেখি উনোনে একটু আঁচ আছে কিনা। ভাত-তরকারি এতক্ষণে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

একটা দম-দেওয়া-যন্ত্রের মত খাবারের থালা নিয়ে আসে কল্পনা। নীতীশ আর তাকায় না তার দিকে। বিষণ্ণ মুখে আস্তে আস্তে ভাত মাখে। আর মাঝে মাঝে খাওয়া থামিয়ে কি ভাবে। ততক্ষণে আর একটা থালা নিয়ে কল্পনাও বসে পড়েছে তার পাশে। কম-কম তরকারি। নামমাত্র ডাল। নীতীশের চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত চালায় কল্পনা। রাত অনেক হল।

বৃষ্টিটাও এমন সময় এল, ঢকঢক করে জল খায় নীতীশ, আর কোন কাজ হল না আজ। ছাত্রের বাড়িতে বসে বসেই সময়টা নষ্ট হল—

মুখ তুলে কল্পনা জিজ্ঞেস করে, আবার কী কাজ?

বাঃ দুটো টাকা মোটে আছে না তোমার কাছে? কাল বাদ পরশু থেকে চলবে কেমন করে?

যাক গে, এখন আর সে কথা ভেবে মুখ ভার করতে হবে না তোমার। জোড়াতালি দিয়ে আমি ঠিক চালিয়ে নেব।

নিশ্বাস ফেলে নীতীশ বলে, তুমি আর কোথা থেকে চালাবে?

খাওয়া শেষ করে খাটে গড়িয়ে পড়ে নীতীশ। এঁটো বাসন রান্নাঘরের কলের কাছে রেখে আসে কল্পনা। ঠিকে ঝি আসবে ভোর ছটায়। যেদিন না আসে সেদিন তার কোনদিকে তাকাবার সময় থাকে না। থেকে থেকে চিৎকার করে নীতীশ সময়টা জানিয়ে দেয়। তার সব সময় ভয় পাছে দেরি হয়ে যায়।

নাক ডাকছে নীতীশের। হাতের দু-একটা কাজ সারতে সারতে কল্পনা দূর থেকে তাকিয়ে থাকে তার ঘুমন্ত মুখের দিকে। কপালের

রেখাগুলো স্পষ্ট হয়েছে। ফ্যাকাশে মুখ। সারা শরীরে ক্লান্তির গভীর ছাপ। দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা চোখে কল্পনা খুট করে আলো নিবিয়ে দেয়।

একরাশ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসে কল্পনা। নিজের জায়গায় শুয়ে পড়ে হাতটা রাখে কপালের উপর। হাওয়ায় শীত-শীত লাগে। কাছাকাছি কোথা থেকে একটানা কিচকিচ শব্দ আসে। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না তার। স্নায়ু টনটন করে। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা। বড় রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি যাওয়ার দমকা চঞ্চলতা। বিছানায় শুয়ে সে এপাশ-ওপাশ করে অনেকক্ষণ। নীতীশের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে যায়। নির্জীব একটা দেহ পড়ে আছে তার পাশে। অবশ অচেতন।

অন্ধকারে ছটফট করতে করতে আগুনের ঝিলিক লাগে কল্পনার মাথায়। শরীরের শিরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। কান দুটো যেন বন্ধ হয়ে যায়। আর মনে হয় যে সে এখন কথা বলতে পারবে না। গলা বসে গেছে। ভাঙা-ভাঙা স্বর বার হবে।

পাশে পড়ে থাকা ঠাণ্ডা পাথরের মত শরীরটা নড়ে না। নাক দিয়ে অস্বাভাবিক শব্দ বার হয়। থরথর করে কাঁপে কল্পনা। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে। যৌবনের উষ্ণ ছোঁয়া লাগে শিরায়-শিরায়। পাশের মানুষটাকে জাগাতেই হবে। নীতীশের হিম-শরীরটার উপর নিজের আগুন-লাগা দেহ আছড়ে দেয় কল্পনা। ফ্যাকাশে মুখটা মুহূর্তের জন্যে অন্য রূপ নিক। দিনের পর দিন রাতের পর রাত অস্বস্তির এই খোঁচা সহ্য করতে পারবে না সে, ধিকধিক করে জ্বলতে পারবে না। একটা অবয়ব আস্তে আস্তে গড়ে উঠুক তার রক্তের স্বাদ নিয়ে। রূপ বদলাক। তার মধ্যে ছটফট করে ভয়ঙ্কর নির্জনতা দূর করে দিক। তারপর তার দেহ তোলপাড় করে আসুক তার সারা দিনরাতের সঙ্গী হয়ে।

হিমশীতল কঠিন পাথরে মুখ ঘষে কল্পনা। ঘুমের ঘোরেই নীতীশ আর একটু দূরে সরে যায়। কল্পনার ব্যগ্র হাতটা আস্তে সরিয়ে দেয়

নিজের ঠাণ্ডা বুকের উপর থেকে ঈষৎ বিরক্ত হয়ে। আর ঠিক তখন একটানা কান্নার মত শহরতলীর শেয়াল ডেকে ওঠে।

নীতীশের মাথাটা জোরে ঝাঁকিয়ে দিয়ে স্বরটা উগ্র করে তোলে কল্পনা, শুয়ে-শুয়ে দুটো কথা বলতে পার না আমার সঙ্গে?

উঁ, পিটপিট করে তাকায় নীতীশ, ভোর হয়ে গেছে?

ভাঙা গলায় কল্পনা বলে, পুরুষ নাকি তুমি?

কিছু বুঝতে না পেরে খাটের উপর নীতীশ উঠে বসে, আরে, হল কী তোমার, অ্যাঁ?

কিছু না।

এদিক-ওদিক তাকায় নীতীশ। ভোর হতে অনেক দেরি। গভীর রাত। হঠাৎ বিরক্তিতে চোখ দুটো ছোট হয়ে যায় তার। একটু বেশী শব্দ করে খাট থেকে নামে কল্পনা। দুপদুপ পা ফেলে কুঁজোর কাছে এগিয়ে গিয়ে পরপর দু-গেলাস জল খায়।

কী হল কি? হাই তুলতে তুলতে আবার নীতীশ জিজ্ঞেস করে।

কিছু না। তুমি ঘুমোও।

কি যে খিটিমিটি কর রাত-বিরেতে। পাশ ফিরে বিড়বিড় করে নীতীশ, কাল ভোরে উঠতে হবে না? এখন রাত কত জান?

চিৎকার করে ওঠে কল্পনা, না, না, না। আমার কাছে দিন রাত সকাল দুপুর সব সমান—রাতের খবরে দরকার কী আমার?

তবে ঘুমোও চুপ করে।

আর কোন কথা বলে না কল্পনা। কার সঙ্গে কথা বলবে? কাকে মেজাজ দেখাবে? প্রাণ আছে নাকি তার পাশের মানুষটার! উত্তেজনায় চোখ বুজতে পারে না সে। নড়ে না। কথাও বলে না। চোখ ঠেলে জল নামে। আর গোঙানির মত কান্নার আওয়াজ সে কিছুতেই চাপতে পারে না। তখন একটা ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া লাগে তার কপালে। নীতীশ চুলে আঙুল চালায়।

কাঁদছ কেন? ভিজে গলার স্বর, ছি, এত রাতে এমন করে কাঁদতে নেই—

নীতীশের হাতটা এক ঝাপটায় সরিয়ে দিয়ে জোরে কেঁদে ওঠে কল্পনা, কেউ নেই আমার—কেউ নেই। একদিন একা-একা আমি ঠিক মরে যাব দেখো—

ও কি কথা? ক্লান্ত দেহটা কোন রকমে কল্পনার কাছে টেনে নিয়ে আসে নীতীশ। তার মনের কথাটা এতক্ষণ পর বুঝতে পেরে তাকে আদর করে বলে, আর একটু যাক—একটু গুছিয়ে নিই, কথা বলতে বলতে সে যেন হাঁপায়, এই অভাবের সংসারে আর একটা কচি প্রাণ এনে কী হবে? তুমি আরও বেশী দুঃখ পাবে তখন—

একটু শান্ত হয় কল্পনা। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমার কাউকেই দরকার নেই।

তার বুকে মাথা দিয়ে নীতীশ শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। আর কল্পনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। সাবধানে নিঃশ্বাস ফেলে—পাছে নীতীশের ঘুম ভেঙে যায়। সারাদিন এত খাটাখাটির পর ভাল করে যদি ঘুমোতে না পারে মানুষটা, তাহলে বাঁচবে কেমন করে। হঠাৎ নিজের ওপর কল্পনার রাগ হয়ে যায়। ক্লান্ত নীতীশের কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে এমন করে আঘাত করবার দুঃখটা যেন কিছুতেই মন থেকে মুছে যেতে চায় না। ঠাণ্ডা অন্ধকারে শুধু তখন দুজন মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

এমন করে জাগানো যায় না। চোখের দু-ফোঁটা জল ফেললেই অভাবের জালটা টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ে না। কিন্তু ওকে জাগাতেই হবে। ওর শুকনো কালিমাখা মুখে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে যৌবনের স্বাভাবিক জৌলুস। তখন ওর শরীরে এত অবসাদ থাকবে না। অকাল বার্ধক্য শিথিল করে দেবে না গায়ের চামড়া। ভাবনায় ভাবনায় কল্পনার যৌবনকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে

রাখবার সাহসও ওর থাকবে না তখন। ভয় করবে না পাছে হঠাৎ কল্পনা আর কাউকে এনে ফেলে এই অভাবের সংসারে। কিন্তু তা কেমন করে হবে। তা কি কোন দিনও হবে না? কাঁটার মত অভাবের এই সংসারটা ছড়ে ছড়ে দিচ্ছে দুজনের দেহ—তার কি হবে।

একটু আগে আজ ফিরে এসেছে নীতীশ। শরীরটা ভাল নেই। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সামান্য জ্বরও হয়েছে বোধহয়। দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরেছে। লাল-লাল চোখ।

একটা গেলাসে অল্প জল ঢেলে নীতীশের পাশে এসে বসে কল্পনা। কাগজের ছোট একটা মোড়ক খুলে দুটো বড়ি মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে হেসে বলে, খাও।

এটা কী?

ওষুধ। খাও না শিগ্‌গির।

কোথায় পেলে? সন্দেহের শুকনো দৃষ্টি নীতীশের চোখে।

ঝিকে দিয়ে আনিয়েছি।

পয়সা পেলে কোথায়?

আমার কাছে ছিল। খাও।

বড়ি গিলে হাত বাড়িয়ে নীতীশ জলের গেলাসটা নেয়। উষ্ণস্বরে বলে, শুধু-শুধু পয়সা নষ্ট কর কেন? একটু মাথা ধরেছে—কাল সকালেই ঠিক হয়ে যেত, একটু থামে ও। লাল চোখে তাকায় কল্পনার দিকে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, আর কত পয়সা আছে তোমার কাছে?

নীতীশের কথার উত্তর দেয় না কল্পনা। গেলাসটা সরিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কয়েক মিনিট ইতস্তত করে। বলবে কি না। না বললে চলবে কেন। যদি রাজি না হয়? বুক ওঠানামা করে ঘন ঘন। ভয় ভয় ভাব। নীতীশের দিকে তাকিয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। তার চোখের সামনে একটা জীবন তিল তিল করে শেষ হয়ে আসছে।

চুড়ি দুটো শব্দ করে টুংটুং, মুদি এসে ফিরে যাচ্ছে রোজ, একবার কেশে গলাটা ঠিক করে নেয় কল্পনা, পনেরো টাকা বাকী হয়েছে। আর ধারে জিনিস দিতে চায় না। আর—

ঠাণ্ডা স্বরে থেমে থেমে নীতীশ জিজ্ঞেস করে, আর কী?

তোমার জন্যে একটা ধুতি না কিনলেই নয়।

এখন থাক, চোখ বুজে থাকে নীতীশ, আলোটা নিবিয়ে দেবে—চোখে বড় লাগছে।

কল্পনা ওঠে না। আর একটু কাছে সরে বসে নীতীশের। হাত দিয়ে বালিশ ঠিক করতে করতে বলে, মার টাকা পাঠানো হয় নি দু মাস। খুব রেগে পোস্ট কার্ড লিখেছেন একটা। উনি ভাবছেন আমিই বোধ হয় টাকা পাঠাতে দিই নি তোমাকে—

ভাবেন তো আর কী করব, কল্পনার হাতটা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে নীতীশ বলে, আসছে মাসে কিছু পাঠাবো এখন। নিয়ম করে মাসে মাসে পাঠানো সম্ভব নাকি আমার পক্ষে!

জোর করেই নীতীশের মাথায় আবার হাত রাখে কল্পনা। আসল কথাটা বলতেই হবে এবার। একটুও হাওয়া নেই। ভ্যাপসা গরম। আয়নায় ধুলো জমেছে। ঝাপসা মুখ। একটু একটু ঘামছে নীতীশ। জ্বরটা ছেড়ে যাবে বোধ হয়। পাশের বাড়ির একতলা থেকে বেশুরো কীর্তনের মাথা-ধরানো আওয়াজ ভেসে আসছে। বলা না-বলার অস্বস্তিতে কল্পনার হাতটা কিছুক্ষণের জন্যে অবশ হয়ে থাকে। দুরু-দুরু আশঙ্কায় বিদ্যুৎ-প্রবাহে মাথাটাও ঝিমঝিম করে। আর একটু পরেই নীতীশ ঘুমিয়ে পড়বে।

এক-নিশ্বাসে বলতে আরম্ভ করে কল্পনা, রাজু কাকা কাল আবার এসেছিলেন—

আবার? পয়সা খরচ করে খাবার আনতে হয়েছিল তো? আত্মীয়দের যত এড়িয়ে যাই—ওরা দেখছি ততই আমাকে পেয়ে বসে। মুখ দিয়ে বিরক্তির একটা শব্দ করে পাশ ফিরে নীতীশ চোখ বন্ধ করে।

উনি বলছিলেন—

কী? দুটো টাকা ধার চাই?

না না, একটু থামে কল্পনা। নীতীশের গালে হাত রেখে শেখানো পাখির মত যেন মুখস্থ বলে, ভবানীপুরে নাচের ইস্কুলে একটা কাজ নাকি খালি আছে—

কাজের কথা শুনে এদিকে তাকিয়ে চোখ খোলে নীতীশ, কী কাজ।

রোজ বিকেলবেলা—এই ধর, ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে ছোট ছোট মেয়েদের নাচ শেখাতে হবে। মাসে মাসে আপাতত মাইনে দেবে এক-শো টাকা।

দূর, হাই তুলে আবার পাশ ফেরে নীতীশ। কল্পনার কথা শুনে মুখটা নিবে যায় ওর, ও-কাজের খবরে আমার দরকার কী?

কল্পনা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে নীতীশকে এপাশে ফেরাবার চেষ্টা করে বলে, আমি বলছিলাম, লক্ষ্মীটি তুমি আপত্তি করো না, কাজটা আমি নিয়েই নি?

তুমি? ঘুম ছুটে যায় নীতীশের। কল্পনার একটা হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে শুকনো হেসে বলে, নাচ শেখানোর কাজ তোমার কেমন করে হবে?

হবে গো হবে, নীতীশের কথার ফাঁকে এর মধ্যেই কল্পনা যেন সম্মতির চাপা আভাস পেয়ে গিয়েছে, বড় ভুলো মন তোমার। আমার কথা কিছুই আর মনে থাকে না, না? হাসতে হাসতে সে বলে যায়, ইস্কুলে কত নাম ছিল আমার জানো না? ইচ্ছে করলে এখনও পারি। পায়ের জোর কম হয়েছে নাকি ভাব? রাজু কাকা বলছিলেন, ভবানীবাবুকে বলে দিলেই আমার কাজটা হয়ে যায়—সংসারে যখন এত অভাব—টাকার এত দরকার—

না না, বিস্মিত নয়, উত্তেজিত নয়, ভীত চাপা স্বরে ফিসফিস করে ওঠে নীতীশ, লোকে বলবে কী?

সাহস পেয়ে নীতীশকে শক্ত করে ধরে কল্পনা। রীতিমত জোরে কথা বলে, রাখ তোমার লোক। কে এসে ধার শোধ করছে তোমার? নিজের কী চেহারা হয়েছে দেখতে পাও না? অত খাটাখাটি করলে কত দিন বেঁচে থাকতে পারে একটা মানুষ, দু-বেলা ছাত্র পড়ানো তোমাকে ছাড়তেই হবে আমি বলে দিলাম—

ছাড়ব? ঠিক বলছ?

অনেক দিন পর নীতিশের কথায় রসিকতার স্বাদ পায় কল্পনা। তার জ্বরের ঘোর যেন একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। চোখ দুটো তত লাল নেই। আর আশ্চর্য, কল্পনার দিকে তাকিয়ে এখনও হাসছে নীতিশ। সেই বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেমন করে হাসতো—ঠিক তেমন করে। একটুও ভুল হয় নি কল্পনার।

অফিসের পর সোজা বাড়ি চলে আসে নীতীশ। ছাত্রদের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে হয় না। দীন চোখে এখানে ওখানে টাকা ধার করতে যাওয়ার পালাও চুকে গেছে। সে ঠিক লক্ষ্য করে না, হয়তো মুখের দু-একটা গভীর রেখাও মিলিয়ে গেছে এতদিনে। সোজা হয়ে চলে নীতীশ। চলতে চলতে চোখে কৌতূহল নিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। আর মাঝে মাঝে সিগারেট ঠোঁটে চেপে চায়ের দোকানেও ঢুকে পড়ে।

আফিস থেকে ফিরতে না ফিরতেই সারা দিনরাতের চাকর চা আর জলখাবার সামনে ধরে দেয়। মাথার উপর পাখা ঘোরে। ঘরের দেওয়াল ঝকঝক করে। অনেকক্ষণ সে আলো জ্বালায় না। নতুন পর্দাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন চোখ দুটো বুজে আসে।

এক সময় চোখ খুলে নীতীশ চমকে ওঠে। একরাশ অন্ধকার। আন্দাজে এগিয়ে গিয়ে সে আলোর সুইচ টিপে দেয়। ঘরটা যেন চমকে ওঠে। আর একটু পরে রাত সাড়ে আটটা বাজবে। তারও

কিছু পরে এড়িয়ে-গড়িয়ে একটা সাইকেল-রিক্শা এসে দাঁড়াবে দরজায়। কল্পনা ফিরে আসবে।

একা একা চুপচাপ বেশিক্ষণ ঘরে বসে থাকতে পারে না নীতীশ। চাকরকে ডেকে আর এক পেয়ালা চা করে দিতে বলে। একবার জানলার কাছে দাঁড়ায়। একবার বাইরে বেরিয়ে অনেক দূর অবধি তাকিয়ে দেখে। সাইকেল-রিক্শার শব্দ নেই। অপ্রশস্ত নির্জন রাস্তা। যেন ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে আছে। নিষ্প্রভ লালচে চাঁদটাকে হালকা মেঘে ঢেকে দেয়। আর নীতীশের মাথাটা কেমন কেমন করে। রোজ রোজ এত রাত অবধি কী কাজ কল্পনার। ভাবতে ভাবতে সিগারেট এত ছোট হয়ে যায় যে নীতীশের মুখে আগুনের আঁচ লাগে।

রিক্শাটাকে মোড় ফিরতে দেখে নীতীশ তাড়াতাড়ি ভিতরে আসে। কল্পনা যেন তাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে না দেখে। একটা পত্রিকা টেনে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখবার ভান করে নীতীশ। থমথমে গম্ভীর। মুখে হাসি নেই। চোখে বিরক্তি।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে কল্পনা। নীতীশের দিকে তাকিয়ে হাসে। কি একটা বলতে গিয়ে ছোট টেবিলের উপর চায়ের কাপ দেখে চোখ রাঙায়, আফিস থেকে ফিরে আবার দু কাপ চা খেয়েছ! না, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। একটা রোগ না বাধিয়ে ছাড়বে না তুমি। রামকে বলে যেতে হবে, কাল থেকে কিছুতেই যেন—

তাকে থামিয়ে কর্কশ কাটা-কাটা স্বরে নীতীশ জিজ্ঞেস করে, এত দেরি কেন তোমার?

একটু দেরি হয়ে গেল। কাল শ্রীরামপুরে যাচ্ছে কি না সব—

থাকগে কৈফিয়তে কাজ নেই, উত্তেজিত আঙুলে নীতিশ পত্রিকার পাতা উল্টে যায়, রোজই তো আজকাল দেরি হয়, রোজ শ্রীরামপুরে যাবার পালা থাকে নাকি ওখানে?

আহা শুধু শুধু রাগ কর কেন? কল্পনা ঝপ করে নীতীশের

পাশে বসে পড়ে বলে, খুব খুশি ওরা আমার কাজে। মাইনেটা বাড়িয়ে দিল বলে। এ বাড়িটা তখন কিন্তু বদলাতে হবে। ভবানী বাবু বলেছেন, ইস্কুলের কাছাকাছি একটা ভাল ফ্ল্যাট দেখে দেবেন। তখন আমার ফিরতে এত দেরি হবে না গো। যাব আর আসব—

হঠাৎ পত্রিকাটা দেওয়ালে ছুঁড়ে মেরে চিৎকার করে ওঠে নীতীশ, আর একটা মোটরগাড়ি কিনে দেবেন না ভবানীবাবু। আরও তাড়াতাড়ি হবে তাহলে—নির্লজ্জ।

বিবর্ণ মুখ। বোবা চোখ। অতর্কিত আঘাত খেলে যেমন হয়। শুকনো চোখ দুটো কাঁপে। কল্পনা সেখানে আর বসে থাকে না। অন্য আর এক যন্ত্রণায় জোরে কেঁদে উঠতে চায়। সে জানে নীতীশের জ্বালা কোথায়। কিন্তু এ কী হল! কী করবে সে। দেওয়ালে মাথা ঠুকে কল্পনা মাটিতে আছড়ে পড়তে চায়।

আর মিশকালো পশুর মত থমথমে ভয়ঙ্কর রাতটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে তাকে। হিস-হিস মসৃণ দীর্ঘ অলস রাত। শেষ হতে চায় না। আলোর আশায় কতবার কল্পনা যে বাইরে তাকায়! নীতীশ যেন অপরিচিত অন্য আর এক জগতের মানুষ। অনেকক্ষণ ঘুমোয় না। মাঝে মাঝে যেন জ্বলন্ত লোহা দিয়ে আঘাত করে কল্পনাকে।

কথাবার্তা সব নাচের ইস্কুলে শেষ করে এসেছ নাকি? নীতীশের কঠিন হাতটা শব্দ করে এসে পড়ে কল্পনার হাতের ওপর।

বিছানার একপ্রান্তে শরীরটা কোন রকমে গুটিয়ে রাখে কল্পনা। ভারী একটা ঠাণ্ডা পাথর—আগেকার নীতীশের মত। শুধু চোখে তার ঘুম নেই। বুকের মধ্যে দপদপে আগুনের একটা পিণ্ড রক্তমাংস পুড়িয়ে পুড়িয়ে বেরিয়ে আসতে চায়। তখন নীতীশকে ভয় করে কল্পনা। আরও সরে আসে। কথা বলে না।

কী ব্যাপার তোমার? একেবারে বোবা হয়ে গেলে!

কী বলবো।

গড়িয়ে গড়িয়ে নীতীশ চলে আসে কল্পনার কাছে। অন্ধকারে

চোখ দুটো জ্বলে ওঠে কাঁপা-কাঁপা উন্মাদনায়। আগুনের আঁচের মত নিঃশ্বাস। কঠিন হাত। কঠিন দেহ।

না না, কল্পনা ছটফট করে, ওগো না—

বয়স বাড়ছে না? এখন না হলে আর কবে? মানুষ করে যেতে হবে না?

নিজেকে মুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টায় কল্পনা আবার বলে, না না, কিছুতেই না, সে উঠে দাঁড়ায়। পাণ্ডুর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। চিকচিক করে চোখ।

মেয়েমানুষ নাকি তুমি? চিৎকার করে ওঠে নীতীশ, আমি জানতাম আমি সব জানতাম—

কি একটা বলতে গিয়ে কল্পনা বলতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, কী জানতে?

এমন করে ধাপে ধাপে তুমি নেমে যাবে, উত্তেজনায় উন্মাদের মত নীতীশ উঠে বসে, চাকরির ছুতো করে তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে। কিন্তু তুমি আমাকে চেন না। আমি খুন করবো তোমাকে—

প্রতিবাদের ভাষা নেই কল্পনার মুখে। পড়ে যেতে যেতে সে কোন রকমে নিজেকে সামলে নেয়। তার পায়ের ভারে ঠাণ্ডা মেঝেও যেন দেখতে দেখতে গরম হয়ে ওঠে। চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। নীতীশ সত্যি তাকে মারবে নাকি?

অভাবের সময় ছেলের জন্যে ঘুম হতো না ওঁর। আমার জন্যে কত ভাবনা, নীতীশের বিকৃত গলার স্বর গমগম করে, আমি কিছু বুঝি না ভাব? আহা, আমার কষ্টে ওঁর বুক ফেটে যায়, একটা বালিশ কল্পনার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নীতীশ বলে, কে তোমার ওই বদমাশ ভবানীবাবু, যার ভাবনায় তুমি আমাকে ঠেলে দিতে সাহস কর? আমার ছোঁয়া বাঁচাতে রাত-বিরেতে উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কারু ধ্যান কর—

আঃ, ক্ষীণস্বরে কল্পনা বলে ওঠে, কী বলছ—

খায়, লাফিয়ে খাট থেকে নেমে কল্পনার কাছে হিংস্র নীতীশ এগিয়ে আসে, তোমার মত মেয়েমানুষের সঙ্গে একঘরে থাকতে প্রবৃত্তি নেই আমার, খট করে খিল খুলে হাতের কঠিন ধাক্কায় সে বাইরে ঠেলে দেয় কল্পনাকে, যাও—বেরিয়ে যাও। আমার কাছে থাকতে হবে না তোমাকে—শব্দ করে নীতীশ দরজার খিল তুলে দেয়।

উঠোনের নিচু দেওয়ালের গায়ে কল্পনা ছিটকে পড়ে। মাথায় লাগে, হাত ছড়ে যায়। অন্ধকারে একটা পোকা ধাক্কা খায় বন্ধ দরজার উপর। টক করে একটা শব্দ। কিন্তু এখন আর একটুও ভয় পায় না কল্পনা। উঠানের পাশে ইঁট বের করা ভাঙা সিঁড়ির উপর বসে সে মাথা তুলে একফালি আকাশের দিকে তাকায়।

কালো পুরু মেঘ। মূক নির্বিকার। অনেক খুঁজে কল্পনা একটা তারা দেখতে পায়। আর পাতলা ধোঁয়ার মত সাদা একটা রেখা কালো মেঘ ঘেঁষে কেটে কেটে যায়। চোখের জলে ভারী পাতা বুজে আসে। অনেক খুঁজে পাওয়া সেই তারাটাও কোথায় হারিয়ে যায়।

কল্পনার চোখ থেকে টপটপ করে জল পড়ে। তার দেহ তোলপাড় করে, সে এলে কী হবে? অক্ষম অকর্মণ্য হয়ে কল্পনা ছটফট করবে ঘরের মধ্যে। শরীর ভেঙে যাবে। তখন এ চাকরিটাও থাকবে না আর।

আবার নীতীশের মুখে রেখার আঁচড় পড়বে। কাঁটা-তারের মত অভাব ঘিরে ধরবে সংসারকে। আর সারাদিন খাওয়ার আশায় একটা শিশু চিৎকার করে কাঁদবে। কিন্তু তার জন্যে এক ফোঁটা দুধও থাকবে না কল্পনার বুকে।

ঠাণ্ডা সিঁড়ি আঁকড়ে কল্পনা বসে থাকে। চাপা কান্নায় শরীরটা ফুলে ফুলে ওঠে ওর। শুধু সেই কথাটা কেন সে বুঝিয়ে বলতে পারে না নীতীশকে।

১৭ই আগস্ট, ১৯৫৯
সোমবার, সন্ধ্যা, কলিকাতা

॥ অবতরণ ॥

এলার্ম দেবার দরকার হয় না। ঘড়িতে কখনও এলার্ম দেয় না মঞ্জুলা। তার ঠিক ঘুম ভাঙে। শেষ রাত্রে। কিম্বা ভোর হবার ঠিক আগে আগে। তাপস যখন বলে তখন।

মঞ্জুলা উঠে বসে। তাপসের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে। ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করে না ওর। ঘুমোক না আর কিছুক্ষণ। সময় তো আছেই আরও। প্লেন ছাড়বে সকাল সাতটায়। ভোর চারটে বাজতে এখনও বাকি কয়েক মিনিট।

তাপস পাশ ফেরে। বোধহয় ঘুমও ভেঙে যায় তার ঠিক সময়। ঘুমন্ত মুখের শান্ত ভাবটা কোথায় মিলিয়ে যায়। তাড়াতাড়ি উঠে বসে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে রিস্টওয়াচ তুলে নেয়। লাইট জ্বেলে ঘড়ি দেখে। ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

লাফিয়ে খাট থেকে নেমে তাপস বলে, কী যে কাণ্ড তোমার! কত দেরি হয়ে গেল দেখ তো—তুলে দাও নি কেন?

আবার গড়িয়ে পড়ে মঞ্জুলা। হাসে তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে। উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বেলে বলে, কিছু দেরি হয় নি—গাড়ি তো আসবে সেই দু ঘণ্টা পর—

ড্রাইভারকে আমি আজ সব চেয়ে আগে আমার এখানে আসতে বলেছি, রেডিও-অফিসার আর কো-পাইলটকে পরে তুলবে—

স্বরে ঝাঁজ মিশিয়ে মঞ্জুলা বলে, সব চেয়ে আগে যাবার দরকার কি তোমার? কতক্ষণের জন্যেই বা থাক বাড়িতে?

ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়াতে জড়াতে তাপস হেসে বলে, কয়েক ঘণ্টা মোটে—আজ তো সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব, মঞ্জুলাকে আদর করে তাপস।

কিন্তু কথা বলবার আর সময় নেই মঞ্জুলার। আর একটু পরেই এয়ার কোম্পানির মোটর এসে দাঁড়াবে দরজায়। একটা তীক্ষ্ণ হর্ন বাজবে। তারপরই কলিং বেল। তাপস দোতলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারকে বলবে, ঠিক হ্যায়।

ভোর-ভোর ঘুমন্ত তাপসকে জাগানো মঞ্জুলার প্রায় বছর খানেকের অভ্যাস। এ বাড়ির আর একটি লোকও জাগে না তখন। বাইরে থেকে কোন মানুষের সাড়া আসে না সহজে। কোথা থেকে ঝিমঝিম করে ট্রেন যায়। তার একটানা বাঁশি বাজে। মোষের গাড়িটা ককিয়ে কাঁদতে কাঁদতে দূরে চলে যায়। বড় রাস্তার ওপর শব্দ করে মোটর গাড়ি।

লাল রঙ। সিরসির করে হাওয়া আসে। সেতারের কাঁপনের মত। আর একটা পাখি ডেকে ওঠে। কেমন অদ্ভুত স্বর তার। পাখিটা উড়ে যায় মঞ্জুলার বাড়ির ওপর দিয়েই।

এদিকে তখন সারা ঘরখানা জেগে উঠেছে। পাখা ঘুরছে বনবন করে। ওটা না হলে তাপসের কিছুতেই চলে না। মঞ্জুলা নিজের চোখে দেখেছে সেই ভোরেও কপাল ঘেমে ওঠে তাপসের। স্টোভে চায়ের জল ফুটছে। টোস্টে মাখন লাগাচ্ছে মঞ্জুলা। অমলেটের ছ্যাকছ্যাক শব্দ শোনা যাবে তারপর।

রুমালটা কই মঞ্জু? তাপস এদিক-ওদিক খোঁজে।

তোমার প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়েছি, ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে এসে মঞ্জুলা তাপসের প্যান্ট শার্ট বেল্ট ব্যাজ সাবধানে বিছানার ওপর রাখে। একেবারে তাপসের পাশে।

তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে কপাল কুঁচকে যায় মঞ্জুলার, ইস, সেই পুরনো ব্লেডটাই ব্যবহার করেছ আজ? কী বিশ্রী কালো দেখাচ্ছে—

ঠিক আছে, শার্টের কলার ঠিক করতে করতে তাপস বলে, ডায়েরি, কলম—

যা করছ তাই কর না, টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে মঞ্জুলা বলে, সব ঠিক আছে।

কিন্তু এত খাবার তুমি কর কেন?

ধমকের সুরে মঞ্জুলা তাপসকে বলে, আস্তে আস্তে ভাল করে সব খেতে হবে—

প্লেটের দিকে তাকিয়ে চোখ টান করে তাপস, এই ভোরে এত খাওয়া সম্ভব? কেন শুধু শুধু এত করতে যাও—

বেশ করি। আবার কখন খাওয়া জুটবে তার ঠিক নেই—কম খেতেই জান শুধু।

কাঁটা চামচের টুং-টাং শব্দ। কল বন্ধ থাকলেও বাথরুমে থেমে থেমে টুপটুপ করে পাতলা জলের ফোঁটা পড়ছে। হাওয়ার ঝাপটায় জানলার হলদে পর্দা উঠছে আর পড়ছে। ছটফট করা নিশানের মত। রাস্তার মাঝখানে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা কুকুরটা গরুর পায়ের শব্দে জেগে উঠেছে। ভয় পেয়ে ডাকছে।

মঞ্জুলাকে একটা প্লেট হাতে নিয়ে বসতেই হয় তাপসের সঙ্গে। কিছু খাক বা না খাক, খাওয়ার ভান না করলে তাপস খেতে চায় না। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে মঞ্জুলার প্লেটের দিকে। মুখের দিকে। চোখের দিকে। এক মিনিটের জন্য হঠাৎ এক অস্বাভাবিক ক্লান্তি আসে তার। আকাশ বিবর্ণ মনে হয়। দিগন্ত চষে বেড়াতে মন সায় দেয় না। এই ঘরের ওপর, বিছানার ওপর, বালিশের ওপর আর মঞ্জুলার ওপর নিবিড় একটা আকর্ষণ অনুভব করে হঠাৎ।

অমলেটের ওপর ছুরি চালিয়ে তাপস বলে, মেননের মেয়ের জন্মদিন না আজ?

হ্যাঁ, ঠিক কটার সময় তুমি ফিরবে বল তো?

সন্ধ্যের আগেই।

মেননের ওখানে তো রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন। তোমার সঙ্গে একবার মার্কেট হয়ে যাব। তখন কিছু একটা কিনে নেওয়া যাবে না হয়—

তোমার তো অনেক কেনা-কাটার দরকার ?

মঞ্জুলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, তুমি ফিরে এস তো আগে—

ঠক করে প্লেটে কাঁটা ঠেকিয়ে তাপস বলে, রাইট।

দেরি করবে না, গলার স্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে মঞ্জুলার, মীটিং-এর ছুতো দেখিয়ে আড্ডা মারবে না কোথাও—এয়ার কোম্পানির মোটরের হর্ন বেজে ওঠে ঠিক তখন। একেবারে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

তাপসের কাপে আরও অনেক চা আছে তখনও। সে উঠতে যাচ্ছিল ; কিন্তু মঞ্জুলা উঠতে দেয় না তাকে। ইশারায় কাপটা দেখিয়ে দেয়। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারকে দেখে। মিষ্টি হেসে বলে, আসছে।

দ্রুত হাতে এয়ার কোম্পানির নাম লেখা ছোট ব্যাগটা গুছিয়ে দেয় মঞ্জুলা। একটা প্যান্ট। একটা শার্ট। একটা তোয়ালে। গোটাকয়েক রুমাল। আর একটা সিগারেটের টিন।

উঠে দাঁড়িয়ে তাপস বলে, ওসবের কোন দরকার নেই। কুচবিহারে যাব আর আসব—

ঘামে ভেজা শার্ট পরে বাড়ি ফিরে আসবে নাকি ? কুচবিহার থেকে ফেরবার সময় নিশ্চয় জামা বদলাবে।

ঠক করে খিল খোলবার শব্দ হয়। সামনেই সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে। ভাল করে ভোর হয় নি তখনও। ভিজে নীলাভ একটা রঙ পড়েছে ধাপগুলোর ওপর। মূক কান্নার মত। ওই সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাবে তাপস। মোটর গাড়িটা দেখা যায় এখান থেকেই। মঞ্জুলা দেখে।

হোক কয়েক ঘণ্টার জন্যে। তাপসের যাবার সময় হলেই কথা সরে না আর মঞ্জুলার মুখে। একেবারে চুপ করে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধু দেখে তাপসকে। দীর্ঘ দেহটা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়। ফিরে ফিরে তাকায় মঞ্জুলার দিকে। চলাটা আশ্চর্যরকম

ভাল তাপসের। যেন ইচ্ছে করলেই আকাশটাকে সে একেবারে হাতের কাছে নামিয়ে আনতে পারে। লাফিয়ে মোটরে ওঠে তাপস। হাত নাড়ে। এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পায় মঞ্জুলা। গাড়িটা সরে যায় তার চোখের সামনে থেকে। হাওয়া ওঠে হু হু করে। ভোরের ভিজে রাস্তা। ধুলো ওড়ে না। সামনেই একটা ল্যাম্প-পোস্ট। নিষ্প্রভ আলো। বোবা। ঠাণ্ডা। ভোরের ভয়ে দপদপ করে। আর একটু পরেই নিবে যাবে।

আবার ঘরে ফিরে আসে মঞ্জুলা। স্টোভটা ঝিমিয়ে আসে। পর্দা স্থির। বিছানার ওপর ভিজে তোয়ালে। তাপসের স্লিপার পায়ে ঠেকে। চেয়ারের হাতলে কুঁকড়ে যাওয়া রাতের জামা। এলোমেলো জিনিসের ভিড়। পাখা তখনও ঘুরছে। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগলেও পাখা বন্ধ করে না মঞ্জুলা। ক্লান্ত। অবসন্ন। খাটের ওপর গড়ায়। ঘুম আর আসে না চোখে। জানলা দিয়ে আকাশ দেখে। অনেকক্ষণ।

আলোটা যে নেবায় নি সেকথা খেয়াল থাকে না মঞ্জুলার। রোদ উঠে গেছে। ভরা সকাল। রাস্তায় গরুর খুরের শব্দ। দরজার তলা দিয়ে চাকর খবরের কাগজটা ঠেলে দিয়েছে ভেতরে। আর কোন কাজ নেই মঞ্জুলার। কোন দায় নেই। বাড়িতে অনেক লোক। তারই ঘরে এত সকালে চাকরটা কড়া নাড়ছে কেন কে জানে। ঈষৎ শিথিল ভঙ্গিতে দরজাটা খুলে দেয় মঞ্জুলা।

যে দরজা দিয়ে তাপস বেরিয়ে গেছে সে দরজা নয়। আরও একটা দরজা আছে তার ঘরে। ভেতরে যাবার। সেখানে যদিও মঞ্জুলার এখন কিছু করবার নেই। আকর্ষণও বোধহয় নেই কোন। তাই ক্লান্তি আসে খিল খুলতে। আঙুলটাতেও টান পড়ে।

চাকর নয়, মঞ্জুলার বড় জা অরুণা। চোখেমুখে উদ্বেগ। শরীর কাঁপছে। এলোমেলো চুল। শক্ত করে মঞ্জুলার হাত চেপে ধরলেন

ঘরের মধ্যেও উঁকি দিলেন একবার। বুঝতে পারলেন তাপস বেরিয়ে গেছে। আরও ভেঙে পড়লেন।

ঠাকুরপো নেই ?

সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসবে—

এ প্রশ্ন নতুন নয়। অরুণাকে দেখে চমকে ওঠে না মঞ্জুলা। তার রকম দেখে ভয়ও পায় না। অনেকবার ঘটেছে এমন মঞ্জুলা এ বাড়িতে আসবার পর। আস্তে আস্তে মঞ্জুলা নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়।

একবার আসবে এ ঘরে ? উনি কেমন করছেন—

সকালের স্বাদটা তেতো-তেতো লাগে মঞ্জুলার। কিছুই নয়—একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেন অরুণা। বয়স হয়েছে, কথায় কথায় এত ঘাবড়ালে চলে এখন। অন্য লোককে সকাল থেকে বিরক্ত করবার কোন মানে হয় না। সে চোখ রগড়ায়। দরজায় ঠেস দিয়ে ঘোমটা ঠিক করে। আস্তে আস্তে চলে অরুণার পিছনে তার ভাসুর যেখানে শুয়ে আছেন সেখানে।

এই ফ্ল্যাটেরই আর একটা ঘর তাপসকে ছেড়ে দিতে হয়েছে তার দাদা আর বউদির জন্যে। শুধু ওরা দুজন নয়। দুটি ছেলে বড় বড় আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে। রমানাথ কাজ করতেন একটা সাধারণ ব্যাঙ্কে। দু-এক বছর হল মেজাজ দেখিয়ে চাকরি খুইয়েছেন। রক্তের চাপ একটু বেশি। আজকাল দিনের মধ্যে অনেকবার অবসন্ন হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে দেখলে মনে হয় আর চোখ খুলবেন না—আর জ্ঞান হবে না। কিন্তু আবার ঠিক হয়ে যায়। চোখ খোলেন। কথাও বলেন। সুবিধা-অসুবিধার কথা তাপসকে জানিয়ে তারই সংসারে কাটান দিনের পর দিন। বিপুল ভারের মত। মেরুদণ্ডে ব্যথা ধরে যায় মঞ্জুলার। তাপসেরও। কিন্তু ওপক্ষ থেকে ভার লাঘব করবার উদ্যম নেই কোন। যেন এটাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। এ নিয়মের পরিবর্তন অসম্ভব।

রমানাথের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মঞ্জুলা। নিশ্বাস

আটকে আটকে যায়। পাখা নেই। গুমোট গরমে শরীরটা ঘেমে ওঠে। আলোও নেই তেমন। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে লাগে। খাট নেই ঘরে। চাকরি যাবার পর দারুণ অভাবের সময় সেটা নাকি রমানাথ নিজেই বিক্রি করে দিয়েছেন খুব অল্প টাকায়।

ছেঁড়া একটা গেঞ্জি গায়ে—মাটিতে শুয়ে দরদর করে ঘামছেন রমানাথ। ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন ধুতি। চোখ বোজা। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছেন। বড় ছেলে বুলটু হাত-পাখা দিয়ে জোরে জোরে হাওয়া করছে। আর এক-ছেলের মন নেই কোনদিকে। বই খুলে একদিকে পড়ছে। মেয়ে দুটো কান্নাকাটি করছে হালুয়ার ভাগ নিয়ে।

মঞ্জুলাকে নিয়ে অরুণা বসে পড়েন মাটিতে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে কেঁদে ওঠেন, ওগো—

আস্তে মঞ্জুলা বলে, আঃ, ডাকবেন না—

কিন্তু একটা কিছু তো করতে হয় ভাই—কি যে করি! ঠাকুরপো নেই বাড়িতে—কি হবে—নৈরাশ্যে একেবারে থিতিয়ে যায় না কিন্তু এখন অরুণার গলার স্বর। বরং মনে মনে ভরসা পান তিনি। মঞ্জুলা এসেছে। নিজের চোখে সব অবস্থা দেখছে। একটা লোককে বিনা চিকিৎসায় মরতে দিতে পারে নাকি কেউ।

মঞ্জুলা বলে, বুলটুকে পাঠিয়ে দিন—একটা ডাক্তার ডেকে আনুক—

কিন্তু তাপস যে নেই—

মঞ্জুলা উঠে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা স্বরে বলে, আমি তো আছি। বুলটু একটু এস তো—

আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বুলটু উঠে দাঁড়ায়। সে বোঝে কেন তাকে ডাকেন কাকীমা। আলমারি খুলে টাকা দেবেন। বুলটু ছুটে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসবে। তারপর সেই টাকা দেওয়া হবে ডাক্তারকে। একটু বেশি করেই বরাবর টাকা দেন তাকে কাকীমা। ছোট কাগজে ডাক্তারের লেখা ওষুধের দামটাও হয়ে যায়।

হিম-লাগা কঠিন পাথরের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মঞ্জুলার দেহ।

মনটা বিষিয়ে যায়। ড্রয়ার টানে কিন্তু কানে দামী কাঠের শব্দটাও বেসুরো লাগে। একদিন নয়—দু দিন নয়—সারাজীবন ধরে শুধু পরের জন্যে খরচ করে যেতে হবে। এর শেষ নেই। নিজেদের জন্যে শেষ অবধি কোন সঞ্চয় থাকবে কিনা কে জানে।

ঝকঝকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বুলটুর হাতে দিয়ে মঞ্জুলা বলে, এটা নাও।

হাত বাড়িয়ে নোটটা নেয় বুলটু। কথা বলে না। ছুটে যায় তার বাবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে। ফিরেও তাকায় না তার কাকীমার দিকে। যদি টাকা কম পড়ে যায় তাহলে আবার ফিরে আসবে—এতটুকু সঙ্কোচ হবে না। ভাবটা যেন—মঞ্জুলার যখন আছে তখন সে দেবেই বা না কেন।

একটু জোরে শব্দ করে খিল তুলে ওদিকের দরজাটা বন্ধ করে দেয় মঞ্জুলা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কঠিন চেহারাটা দেখে চুল ঠিক করে নেয়। তার চাকর কাজ করছে আপন মনে। তাপসের ছেড়ে যাওয়া কাপড় গুছিয়ে রাখছে। স্টোভ সরিয়ে রাখছে। চায়ের বাসন ধুতে নিয়ে যাবে এবাব।

অনেক আলো। অনেক বাতাস। কিন্তু মাথা ধবে যায় মঞ্জুলার। কপাল ঘেমে ওঠে। এই একটা ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। সব আছে অথচ কিছুই নেই। এত সুন্দর ফ্ল্যাট কিন্তু মনেব মত করে সাজাতে গেলেই বাধা। খেয়াল-খুশি মত মঞ্জুলা কিছুই করতে পারে না।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম এত তলিয়ে ভেবে দেখে নি সে—প্রয়োজনও বোধ করে নি। আকাশে-আকাশে উড়ে বেড়াবে তাপস। যখন তখন। শুধু দিনে নয়—রাতেও। তখন মঞ্জুলা একা থাকবে কেমন করে। আর তো কোন মানুষ নেই এ বাড়িতে।

মনে মনে প্রস্তুত হয়েই তাপস বলেছিল মঞ্জুলাকে, দাদাকে এবার একটু কায়দা করে একটা ব্যবস্থা করবার কথা বলতে হয়—

"কিসের ব্যবস্থা ?"

আলাদা থাকবার। আরও যদি দু-একটা ঘর থাকত এই ফ্ল্যাটে তাহলে না হয় ওরা থাকতে পারত। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে এখন—আর তা ছাড়া একটা খাবার ঘরেরও তো দরকার—

না না, তাপসের কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে মঞ্জুলা বলে উঠেছিল, তা হয় না। ওঁরা থাকুন যেমন আছেন তেমন। এই বয়সে দাদা কোথায় যাবেন ?

তা কি আমার ভাববার কথা ?

এতদিন তো ভেবেছ—

মঞ্জুলার মহত্ত্বের আভাস পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল তাপসের মুখ, এতদিন আমার নিজের কথাও তো ভাববার দরকার হয় নি। কিন্তু এখন ভাবনার রকমটা তো আর আগের মত হলে চলবে না। সব চেয়ে আগে তোমার কথা ভাবতে হবে।

তা বলে ওদের আলাদা করে দেবে নাকি ? তোমার আপন দাদা-বউদি না ? লোকে বলবে কি ? মঞ্জুলা লোকের কথাটা নিজেই বলে দিয়েছিল, যেন আমি এসে সকলকে তাড়িয়েছি—ওসব চলবে না, বলে দিলাম।

বিশেষ কিছু মনে হয় নি প্রথমে মঞ্জুলার। ছেলেদের চেঁচামেচি। মেয়েদের কান্না। ভাসুরের সন্দেহ দৃষ্টি। জায়ের সমবেদনা। ভরা সংসার। কোন দায় নেই। মঞ্জুলার এখানে নিশ্চিন্ত আরাম।

হালকা দেহটা খাটে এলিয়ে দিয়ে সে মাথার কাছের জানলা খুলে দেবে। তখন শুধু আকাশটা চোখে পড়বে তার। সাদা পাতলা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ঝলমল করছে চিকন রোদের আভায়। পাখা সোজা করে চিল ভাসছে। একটা ছোট কালো পাখি জোরে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে চলে যাচ্ছে। সব ছাড়িয়ে বিরাট বিদেশী পাখির মত গুঞ্জন তুলে সাঁতার কাটছে একটা আকাশ-যান। মঞ্জুলা দেখে। দেখে দেখে আশ মেটে না। জানলা দিয়ে রোদ আসে।

মনটা বিষিয়ে যায়। ড্রয়ার টানে কিন্তু কানে দামী কাঠের শব্দটাও বেসুরো লাগে। একদিন নয়—দু দিন নয়—সারাজীবন ধরে শুধু পরের জন্যে খরচ করে যেতে হবে। এর শেষ নেই। নিজেদের জন্যে শেষ অবধি কোন সঞ্চয় থাকবে কিনা কে জানে।

ঝকঝকে একটা দশ টাকার নোট বের করে বুলটুর হাতে দিয়ে মঞ্জুলা বলে, এটা নাও।

হাত বাড়িয়ে নোটটা নেয় বুলটু। কথা বলে না। ছুটে যায় তার বাবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে। ফিরেও তাকায় না তার কাকীমার দিকে। যদি টাকা কম পড়ে যায় তাহলে আবার ফিরে আসবে—এতটুকু সঙ্কোচ হবে না। ভাবটা যেন—মঞ্জুলার যখন আছে তখন সে দেবেই বা না কেন।

একটু জোরে শব্দ করে খিল তুলে ওদিকের দরজাটা বন্ধ করে দেয় মঞ্জুলা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কঠিন চেহারাটা দেখে চুল ঠিক করে নেয়। তার চাকর কাজ করছে আপন মনে। তাপসের ছেড়ে যাওয়া কাপড় গুছিয়ে রাখছে। স্টোভ সরিয়ে রাখছে। চায়ের বাসন ধুতে নিয়ে যাবে এবার।

অনেক আলো। অনেক বাতাস। কিন্তু মাথা ধরে যায় মঞ্জুলার। কপাল ঘেমে ওঠে। এই একটা ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। সব আছে অথচ কিছুই নেই। এত সুন্দর ফ্ল্যাট কিন্তু মনের মত করে সাজাতে গেলেই বাধা। খেয়াল-খুশি মত মঞ্জুলা কিছুই করতে পারে না।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম এত তলিয়ে ভেবে দেখে নি সে—প্রয়োজনও বোধ করে নি। আকাশে-আকাশে উড়ে বেড়াবে তাপস। যখন তখন। শুধু দিনে নয়—রাতেও। তখন মঞ্জুলা একা থাকবে কেমন করে। আর তো কোন মানুষ নেই এ বাড়িতে।

মনে মনে প্রস্তুত হয়েই তাপস বলেছিল মঞ্জুলাকে, দাদাকে এবার একটু কায়দা করে একটা ব্যবস্থা করবার কথা বলতে হয়—

কিসের ব্যবস্থা ?

আলাদা থাকবার। আরও যদি দু-একটা ঘর থাকত এই ফ্ল্যাটে তাহলে না হয় ওরা থাকতে পারত। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে এখন—আর তা ছাড়া একটা খাবার ঘরেরও তো দরকার—

না না, তাপসের কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে মঞ্জুলা বলে উঠেছিল, তা হয় না। ওঁরা থাকুন যেমন আছেন তেমন। এই বয়সে দাদা কোথায় যাবেন ?

তা কি আমার ভাববার কথা ?

এতদিন তো ভেবেছ—

মঞ্জুলার মহত্ত্বের আভাস পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল তাপসের মুখ, এতদিন আমার নিজের কথাও তো ভাববার দরকার হয় নি। কিন্তু এখন ভাবনার রকমটা তো আর আগের মত হলে চলবে না। সব চেয়ে আগে তোমার কথা ভাবতে হবে।

তা বলে ওদের আলাদা করে দেবে নাকি ? তোমার আপন দাদা-বউদি না ? লোকে বলবে কি ? মঞ্জুলা লোকের কথাটা নিজেই বলে দিয়েছিল, যেন আমি এসে সকলকে তাড়িয়েছি—ওসব চলবে না, বলে দিলাম।

বিশেষ কিছু মনে হয় নি প্রথমে মঞ্জুলার। ছেলেদের চেঁচামেচি। মেয়েদের কান্না। ভাসুরের সন্দেহ দৃষ্টি। জায়ের সমবেদনা। ভরা সংসার। কোন দায় নেই। মঞ্জুলার এখানে নিশ্চিন্ত আরাম।

হালকা দেহটা খাটে এলিয়ে দিয়ে সে মাথার কাছের জানলা খুলে দেবে। তখন শুধু আকাশটা চোখে পড়বে তার। সাদা পাতলা ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ঝলমল করছে চিকন রোদের আভায়। পাখা সোজা করে চিল ভাসছে। একটা ছোট কালো পাখি জোরে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে দূরে চলে যাচ্ছে। সব ছাড়িয়ে বিরাট বিদেশী পাখির মত গুঞ্জন তুলে সাঁতার কাটছে একটা আকাশ-যান। মঞ্জুলা দেখে। দেখে দেখে আশ মেটে না। জানলা দিয়ে রোদ আসে।

বিছানা গরম হয়ে যায়। যাক। জানলা বন্ধ করতে হাত ওঠে না আর।

তাপস আকাশে উড়ে বেড়ায়—মঞ্জুলা যায় না বটে তার সঙ্গে কিন্তু মনে মনে মাটির সব স্পর্শ এড়িয়ে সেও যেন হঠাৎ অনেক ওপরে উঠে যেতে চায়—প্রপেলারের দ্রুত ঘূর্ণনে গতির ঝাপটায় আকাশে উঠে যাওয়া প্লেনের মত। বেরিয়ে পড়তে চায় এখানে-ওখানে। ঘর সাজাবার টুকিটাকি জিনিস কিনতে কিম্বা হাসপাতালে ক্যাপ্টেন চৌধুরীর স্ত্রীকে দেখতে। শাড়ির দোকানে। কিম্বা কাঠের ফার্নিচারের নতুন শো-রুমে। একা একাই। কিন্তু তা হয় না। ঘর কম। লোক অনেক।

মঞ্জুলা এক সময় তাপসকে বলে, ঘরটা আর একটু বড় হলে বেশ হতো না?

একটু উষ্ণ শোনায় তাপসের গলার স্বর, ঘর কি আর নেই এ বাড়িতে?

মঞ্জুলা আস্তে আস্তে বলে, লোকও তো আছে।

মঞ্জুলা আজকাল বোঝে, ওঁদের জন্যে অসুবিধা হয় অনেক। শুধু জায়গার জন্যে নয়, দুই পরিবারের মাঝখানে যেন প্রভেদের একটা পুরু রেখা টানা আছে। এ বাড়িতে যখন তাপস কিম্বা মঞ্জুলার বন্ধু-বান্ধব আসে আর যদি হঠাৎ ওঘর থেকে কেউ ছিটকে এসে পড়ে এদের মাঝখানে তখন প্রভেদের সেই রেখাটা সাংঘাতিক রকম পীড়া-দায়ক হয়ে ওঠে দুজনের কাছে। যদিও তাপসের মুখে কথা সরে না তবুও মঞ্জুলার সব বুঝে নিতে দেরি হয় না এক মিনিটও।

উঠেই বাঁ দিকের প্রথম ঘর। কলিংবেল আছে ওই ঘরের দরজার গায়েই। ছোট একটা কালো কাঠের ফলকে তাপসের নাম লেখা। এয়ার কোম্পানির বড় বড় অফিসার, তাপসের দেশী-বিদেশী বন্ধুবান্ধব কিম্বা মঞ্জুলার কেউ এলে ওই ঘণ্টাটাই বাজায়। রিনরিন একটা মিষ্টি আওয়াজ ছন্দের তরঙ্গ তোলে। তখন মঞ্জুলার সেই ছোকরা চাকর—

পরনে সাদা শার্ট আর পায়জামা—যেখানেই থাকুক—ছুটে এসে দরজা খুলে দেয়। পাখা খোলে। হাসি মুখে অতিথিকে বসতে বলে সব চেয়ে আগে। তাপস না থাকলে মঞ্জুলাকে এসে খবর দেয়।

তাপস থাকুক বা না থাকুক, খবর পেয়ে বসবার ঘরে চলে আসতে একেবারেই দেরি হয় না মঞ্জুলার। সন্ধ্যেবেলায় একটু বেশি মাত্রায় প্রসাধন করা তার কুমারী জীবনের অভ্যাস। বিয়ের পর সে অভ্যাস আরও আয়ত্ত করে নিয়েছে মঞ্জুলা। শুধু তার নিজের সাধ মেটাবার জন্যে নয়, তাপসের পদমর্যাদার কথা ভেবেও।

কয়েকদিন আগেকার কথা। কলিংবেল বেজেছিল একটু আগে। এ ঘরের দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে দেখবার অবসর পায় নি মঞ্জুলা। সোনালী পাড়ের হালকা সাদা শাড়িটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গায়ে জড়াচ্ছিল। পিটপিট করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেন ফোঁটা ফোঁটা বিরক্তি জমা হচ্ছে জানলার শিকগুলোয়—মঞ্জুলার মনেও। বাইরে যাওয়া কঠিন আজ। একা একা সন্ধ্যেবেলা ঘরে বসে থাকতে ভালও লাগে না। অরুণা এসে আবোল-তাবোল বকেন। হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন মঞ্জুলার বেশভূষার দিকে। জিনসগুলো টানাটানি করে তছনছ করে দেয় ছোট মেয়ে দুটো। বারণ করেন না ওদের মা। বোধহয় ছেলেবেলা থেকে ওদের মনেও এই বোধটা জন্মে দিতে চান যে মঞ্জুলার সাজানো ঘরখানাকে লণ্ডভণ্ড করে দেবার তাদের একটা জন্মগত অধিকার আছে। ওরা চিৎকার করে। আর এক সুরে অরুণা তাঁর দুঃখের কথা জানিয়ে যান। কি নেই, চেয়ে চেয়ে ছেলে মেয়েরা কি পায় না আর তাঁর স্বামীর একটানা অভাব—করাতের মত কেমন করে তাকে চিরে-চিরে দিচ্ছে।

ভর সন্ধ্যায় এসব কথা শুনতে মঞ্জুলার ভাল লাগে না। রেডিওটা জোরে করে দেয়। যেন ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরেজী বক্তৃতা শোনায় তার কতই আগ্রহ। মেয়ে দুটো জোর আওয়াজ শুনে রেডিওর কাছে ছুটে চলে আসে। আন্দাজে চাবি ঘুরিয়ে আরও জোরে

আওয়াজ বের করে। মাথাটা ধরে মঞ্জুলার। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে রেডিওর কাছে। হঠাৎ একেবারেই বন্ধ করে দেয় যন্ত্রটা। স্বরে ঈষৎ বিরক্তি মিশিয়ে মেয়েদের বলে, অন্য কোথাও গিয়ে খেলা করতে।

আস্তে বললেও অরুণা শুনতে পান কথাটা। মুখে একটা ছায়া পড়ে তাঁর। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কোথায় আর যাবে বল? ওই তো ছোট্ট একখানি ঘর। উনি শুয়ে থাকেন। ছেলে দুটো পড়ে। ওদেরও তো একটু ছুটোছুটি করে খেলা করতে সাধ যায়, বিষন্ন দৃষ্টিতে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তিনি একটা ছোট নিশ্বাস ফেলেন, বসবার ঘরে যাওয়া আবার ঠাকুরপো পছন্দ করে না। চল রে—যেমন কপাল করেছিস—

যেন সব দায় মঞ্জুলার। ব্যাপারটা সহজ করে দেবার জন্যে তবু সে তাড়াতাড়ি বলে, আহা, ওরা খেলুক না এঘরে। আমি না হয় বাইরের ঘরে গিয়ে বসছি—ওই তো কলিংবেল বাজছে—কেউ না কেউ এসেছে নিশ্চয়ই—

ছোকরা চাকর মঞ্জুলার ভাসুরের ঘরের মধ্যে দিয়ে ছুটে যায়। ঘুরে গিয়ে ভেতর থেকে বসবার ঘরের দরজা খুলবে। যে-ই আসুক, মঞ্জুলাকে যেতেই হবে সে ঘরে একবার। হয়তো খবর নিয়ে এসেছে কেউ যে, তাপসের ফিরতে আরও দু একদিন দেরি হবে কিংবা বাড়ি ফিরে আসবে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে। বাড়িতে খাবার ঠিক থাকে যেন তার।

চাকর ছুটে এসে এক সুরে বলে, সেই সাহেব আর মেমসাহেব।

কোন্ মেমসাহেব?

সেই যে আমাকে দু টাকা বখশিশ দিয়েছিলেন, হেঁ হেঁ—তেনেরা এসেছেন—

চঞ্চল হয়ে ওঠে মঞ্জুলা। হলুদ-কালো স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে নেয়। সান্যাল আর তার স্ত্রী এসেছে। মাদ্রাজী স্ত্রী সান্যালের।

বছর দু-এক আগে বিয়ে হয়েছে। কি একটা উপলক্ষে সান্যাল মাদ্রাজে গিয়েছিল। সেখানেই নাকি ওদের আলাপ। হয়তো এসেছে নেমন্তন্ন করতে। বাড়িতে প্রায়ই ভোজের ব্যাপার লেগে থাকে তাদের। মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে মঞ্জুলার। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। টিপটিপ বর্ষণের বিরক্তিও মন থেকে মুছে যায়। প্রজাপতির মত হাল্কা পাখায় ভর করে যেন সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সামনেই। যেখানকার হাওয়া একেবারেই অন্যরকম। অনুযোগ নেই। অভিযোগ নেই। অভাব নেই। প্রয়োজনের পুনঃপুনঃ ক্লান্তিকর বিবৃতি নেই। এ ঘরে আসবার আগ্রহে চেহারাটা একেবারেই অন্যরকম দেখায় মঞ্জুলার।

সান্যাল উঠে দাঁড়ায়, কাল ফিরেছি আসাম থেকে। তাপস কই? আপনাদের খবর নিতে এলাম।

বসুন বসুন, মঞ্জুলা মিসেস সান্যালের দিকে তাকিয়ে হাসে, কেমন আছেন? উত্তরের অপেক্ষা না করে বলে, উনি ফিরবেন এ সপ্তাহের শেষে। মাদ্রাজে গেছেন কিনা—নিজেই জোরে হেসে ওঠে মঞ্জুলা। রসিকতার প্রচ্ছন্ন সুর থাকে তার কথায়। যেন মাদ্রাজ জায়গাটা এমন যে সেখান থেকে সহজে ফেরা যায় না। সান্যালের স্ত্রী পদ্মা বেশ বাঙলা শিখে গেছে এর মধ্যে। মঞ্জুলার রসিকতার অর্থ বুঝতে দেরি হয় না তার।

পকেট থেকে কেস বের করে সিগ্রেট ধরাতে ধরাতে সান্যাল বলে, যখনই কলকাতায় আসি তাপসটার সঙ্গে দেখা হয় না, ছাইদানে কাঠি ফেলে দেয় সান্যাল, কিন্তু আপনাদের দুজনকে শনিবার সন্ধ্যাবেলা বিশেষভাবে দরকার ছিল যে—

ভাঙা ভাঙা বাঙলায় পদ্মা বলে, আপনাকে যেতেই হবে—

কথাটা আরও পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় সান্যাল। ওদের বিয়ের দু বছর পূর্ণ হবে সেদিন। যদি তাপস ফিরে আসে তো ভালই, কিন্তু সে না ফিরলেও মঞ্জুলাকে যেতেই হবে সেদিন। পদ্মাও সে কথাটা নানাভাবে তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

যাবে বইকি—নিশ্চয়ই যাবে মঞ্জুলা। এমন করে বার বার অনুরোধ জানাবার কোন দরকার নেই ওদের। কে চায় দুর্ভাগ্য আত্মীয়দের সঙ্গে নীরস দিন কাটাতে। তাপস না থাকলে অসুবিধা নানাদিক থেকে আরও অনেক বাড়ে তার। ওদিকের দরজায় খিল তুলে রাখা যায় না বেশীক্ষণ। জোরে জোরে ধাক্কা মারেন অরুণা। কোন তরকারিটা মঞ্জুলার ভাল লাগে জানতে চান—কি মাছ আনবেন সে কথাও জিজ্ঞেস করেন। এ কথাটা বোঝবার মত বুদ্ধি নেই তাঁর যে রান্নাঘরের মেঝেতে বসে একসঙ্গে খাওয়ার এতটুকু রুচি হয় না তার। তাই যা ইচ্ছে রান্না করুন না তিনি—নিজেদের খুশিমত। মঞ্জুলার টাকা বের করে দেবার কথা—সে তাই দেবে। সংসারের আর সব ভার অরুণার ওপর।

তাপস যখন থাকে, তখন এত অসুবিধা হয় না মঞ্জুলার। প্রায়ই বাইরে ঘুরে ঘুরে খাওয়া-দাওয়া সারে তারা—বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে, হোটেলে কিম্বা রেস্তোরাঁয়। আর বাড়িতে থাকলে ঘরেই খাবার আয়োজন করে মঞ্জুলা। ছোট টেবিলটা টেনে দুপাশে দুটো কাঠের চেয়ার রাখে। শুধু তখনই নিজে ঘন ঘন রান্নাঘরে যায়।

সান্যাল আর পদ্মার কথায় তাই একটু বেশিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে ওঠে মঞ্জুলা। অনেক ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই যাব।

সান্যাল জিজ্ঞেস করে, যদি তাপস না ফেরে, তাহলে তো যেতে বেশ অসুবিধা হবে আপনার—গাড়ি পাঠাবো ?

না না, মঞ্জুলা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, আমি নিজেই যেতে পারবো ঠিক—

কথা শেষ হয় না মঞ্জুলার। চমকে ওঠে। ভয় পায়। যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা সামনে দেখেছে। বিবর্ণ হয়ে যায় মুখ। এই ঘরটা দুলছে—ঘুরছে। নিজেকে যেন আর ধরে রাখতে পারছে না মঞ্জুলা। শরীরটা কাদায় ধসে পড়ছে। কাদার একটা তাল্‌ই যেন তার মুখে মাখিয়ে দিলেন ভাসুর।

পদ্মা আর সান্যাল বসে থাকতেই রমানাথ এসে ঢোকেন ঘরে। গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি। কাঁধের কাছটা বিশ্রীভাবে ছিঁড়েছে। ছেঁড়াটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছাতা নেই। বৃষ্টিতে ভিজেছেন। কাশছেন খক খক করে। ছোট ছেলে মণ্টুও রয়েছে সঙ্গে। গায়ে আধ-ময়লা সাদা শার্ট। ছেঁড়া চটিতে কাদা লেগেছে। মাথা নিচু করে আছে।

ওদের সকলের দিকে খুশি মুখে তাকিয়ে ধপ করে সোফায় বসে পড়েন রমানাথ। আগ্রহে হাতটা একটু বেশীই লম্বা করেন বোধ হয়। মঞ্জুলার দিকে একটা খবরের কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, এই দেখ বউমা, মণ্টু ফাস্ট ডিভিশনে পাস করেছে—তাপু শুনলে কত খুশি হবে—

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নেয় বটে মঞ্জুলা, কিন্তু কথা জোগায় না তার মুখে। তাকাতে পারে না পদ্মা আর সান্যালের দিকে। ওরা একটু আগে উঠে গেলেই সবচেয়ে ভাল হতো। দুঃস্থ ভাসুরের এই দীন চেহারাটা শুধু শুধু কেন দেখতে হল তাদের।

মণ্টুর পাসের খবর শুনে তাপস খুশি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ওদের এই ঘরে দেখে একটুও খুশি হতে পারে না মঞ্জুলা। পদ্মা আর সান্যালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারে না—চায়ও না। মণ্টু ঢিপঢিপ করে প্রণাম করে সকলকে।

হঠাৎ নিজেকে যেন খুঁজে পায় মঞ্জুলা। একটা কিছু না বললেই নয়, তাই প্রত্যেকের মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ভেবে ভেবে থেমে থেমে বলে, বাঃ খুব ভাল ছেলে। জানেন, একেবারে নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে পাস করেছে—এসব সে বলে বটে, কিন্তু কথাগুলো এমন অদ্ভুত বেসুরো শোনায় মঞ্জুলার নিজেরই কানে যে, তার পরে মনে হয় চুপ করে বসে থাকলেই ভাল হতো।

রমানাথ আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু মাথার ঘোমটা টানবার ভান করে সম্পর্কের কথা ভুলে মঞ্জুলা তাড়াতাড়ি বলে

ওঠে, আগে দিদিকে খবরটা দিয়ে আসুন, উনি ব্যস্ত হয়ে বসে আছেন—

ঠিক বলেছ ছোট বউ—ঠিক বলেছ—মণ্টুর হাত ধরে চটির শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যান রমানাথ। আর এ ঘরে বসে সে লজ্জায় কুঁকড়ে যায়।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। তবু মঞ্জুলা নিজের থেকেই যেন সাফাই গায়, বড় গরিব ছেলেটি। আমাদের এখানে থেকেই পাস করেছে, হেসে ওঠে সে: অল্প বয়স কিনা তাই ভেবে পাচ্ছে না কি করবে—

কিন্তু এইভাবে বার বার সাফাই গাওয়া যায় না। এক বাড়িতে বাস করে বেশিদিন ওই দীন শুষ্ক মানুষগুলোর পরিচয় লুকিয়ে রাখা যায় না। জীবনের রঙে কালি লাগে। চলতে গেলে হোঁচট খেতে হয়। হাসি আসে না। মুখ যেন বিকৃত হয়ে থাকে মঞ্জুলার। ওরা যেন অভাবের প্রতিমূর্তি। শুধু নিজেদের নয় মঞ্জুলাকেও শেষ করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে একটু একটু করে। তাপসকে গলা টিপে ঠেলে রাখছে একটা অন্ধকার কূপের মধ্যে। সব থাকতেও যেন কিছু নেই মঞ্জুলার। থেকে থেকে তার নিজের অভাব-বোধটাই সবচেয়ে বেশি প্রবল হয়ে ওঠে।

এই বাড়িতে বসে সতর্ক হয়ে টিপে টিপে চলতে মঞ্জুলার আর ভাল লাগে না। কেবলই দাবি—অমানুষের মত—একটির পর একটি। যেন শেষ নেই। চাপা বিরক্তি প্রকট হয়ে ওঠে।

আর পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে মঞ্জুলার নিজেকেই আজকাল সব চেয়ে দীন বলে মনে হয়। সে দেখে সান্যাল আর পদ্মাকে, চৌধুরী আর রমাকে, মেনন আর ললিতাকে। ঝকঝকে ফ্ল্যাট। ছিম-ছাম সাজানো সংসার। মোটরগাড়ি। ওদের আত্মীয়রা যখন আসে, একই সঙ্গে খেতে তখন তাদের নিয়ে লজ্জায় পড়তে হয় না কাউকে মঞ্জুলার মত—মাথা উঁচু করেই ওরা পরিচয় দেয় তাদের।

আর মঞ্জুলা? একটা খাবার ঘর নেই বাড়িতে—একটা দেখাবার মত লোক নেই। তাই কাউকে খেতে বললে বাইরে ব্যবস্থা করতে হয়। খরচেরও সীমা থাকে না। আর এই বাড়িতে বসে দিনের বেলা ভাল করে কথা বলা যায় না তাপসের সঙ্গে।

একটা ব্যবস্থা মনে মনে করে ফেলে মঞ্জুলা। বসবার ঘরটা বেশ বড়। সেখানে কিছু অংশ আলাদা করে খাবার জায়গা করবে। আজকাল তো অনেকেই করে থাকে অমন। খাবার একটা টেবিলও এর মধ্যে দোকানে গিয়ে একদিন দেখে আসে মঞ্জুলা।

তাপসকে বলে এক সময়, দেড়-শো টাকা বেশি খরচ করবো আমি এ মাসে—একটা সুন্দর ডিনার টেবিল দেখে এসেছি।

এ মাসে? একটু থিতিয়ে যায় তাপসের গলার স্বর, দাদাকে দিতে হবে যে টাকাটা—মণ্টুর বই কেনার আর কলেজে ভর্তি হবার খরচ—

তাই দাও, একটা ধাক্কা খায় যেন মঞ্জুলা। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় তাপসের দিকে। আর কোন কথা বলে না।

তাপস নিজেই বিরক্তি প্রকাশ করতে থাকে তখন। আর পারা যায় না এমন করে। আর চালানো যায় না। ওদের এবার বলতে হবে অন্য কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করবার। তাপস না হয় কিছু কিছু খরচ দেবে মাসে মাসে। সব দিক বিবেচনা করে ওদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকা এখন আর শোভন নয় কোনমতেই।

তাপসের গলা পেলেই অরুণা আসেন একবার এ ঘরে। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েন। ধোপার খরচের হিসেবটা কথায় কথায় জানিয়ে দেন মঞ্জুলাকে। বলেন, ধোপা অপেক্ষা করছে বাইরে—টাকাটা এখন চুকিয়ে দিলেই ভাল হয়।

আসবে—একজনের পর আর একজন। তাপস যতক্ষণ বাড়িতে থাকবে ততক্ষণ। যেন মঞ্জুলার হাত-টান। সে বঞ্চিত করতে চায় ওদের সকলকে। খাতা কেনবার কথাটাও মণ্টু মঞ্জুলাকে জানায়

তাপসের সামনেই। ছেঁড়া জামাটা গায়ে দিয়ে রমানাথ বোধহয় ইচ্ছে করেই ঘোরাঘুরি করেন। চোখে পড়ুক তাপসের। সে বলুক কিছু। একটা ব্যবস্থা করে দিক।

আর মঞ্জুলা গুটিয়ে নিক নিজের প্রয়োজন। জগৎটা দেখুক ওদের মত ছোট করেই। ওদের মত কাটাক দিন। ওদেরই জন্যে প্রত্যেকটি পয়সা ব্যয় করে। একটা সৃষ্টিছাড়া নিয়ম। তা ভাঙবার সাধ্য নেই মঞ্জুলার।

তাপসের ফেরবার সময় হল। হাওয়া দিয়েছে। বিকেল গড়িয়ে গেল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই। শক্ত হাতে মঞ্জুলা খিল তুলে দেয় দরজার। জানলাটা ভাল করে খুলে দেয়। তাপস আসবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। প্রথমে নিউমার্কেটে তারপর আলিপুর—মেননের বাড়িতে।

এ বাড়ির বাকী মানুষগুলোর কথা এখন আর মনে থাকে না মঞ্জুলার। নানা সরঞ্জাম নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সে প্রসাধন করে অনেকক্ষণ। কৃত্রিম দু-একটা আঁচড়ে তার রূপটাই যেন পাল্টে যায়। আয়নায় নিজেকে বার বার দেখে মঞ্জুলা। সাধ মেটে না। চোখের ভুরুতে আবার তুলি টানে।

আলমারি খুলে সে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। দিশাহারা ভাব। কোনটা পরবে হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। একটু পরে আলমারির পাল্লাটা ভেজিয়ে দেয় আস্তে। এখন থাক। তাপস এলে তার পছন্দমত একটা শাড়ি পরে বেরিয়ে পড়লেই চলবে এখন।

দুপুরে ভাল ঘুম হয় নি আজ। দিনের বেলা একটু না ঘুমিয়ে নিলে ক্লান্তি আসে মঞ্জুলার—চেহারা ম্লান দেখায়। পাখাটা জোরে চালিয়ে সামনের ইজিচেয়ারটায় সে গা এলিয়ে দেয়। স্টোভ রয়েছে হাতের কাছেই। চায়ের সরঞ্জামও সাজানো রয়েছে। ফিরেই চা খেতে চাইবে তাপস।

নিশ্চিন্ত হয়ে বসেও থাকতে পারে না মঞ্জুলা। দরজার ওধারে হুড়োহুড়ি করছে বাচ্চারা। অরুণার ঝাঁজালো গলার স্বরে বিরক্তি আসে। একটা ঘরেই তো থাকে সব মানুষ কটা—অত চিৎকার করে কথা বলবার কি দরকার। দৈবদুর্বিপাকে অবস্থা ভেঙে পড়লে শালীনতা জ্ঞানও চলে যায় নাকি মানুষের।

মঞ্জুলা উঠে বসে। ছটফট করে। এ বাড়িতে থেকে আর সময় নষ্ট করতে চায় না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। অধীর হয়ে পড়ে। তাপসের পায়ের শব্দ শোনবার জন্য কান পেতে থাকে।

হঠাৎ কেমন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ শুনে মঞ্জুলা চমকে ওঠে। রমানাথের অস্পষ্ট গোঙানি, অরুণার তীক্ষ্ণ ভয়ার্ত চিৎকার—মঞ্জুলার দরজা যেন অনেক হাতের প্রবল ধাক্কায় ভেঙে পড়তে চায়।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে যায় মঞ্জুলার। ইচ্ছে করেই সাড়া দেয় না অনেকক্ষণ। দরজা খুললেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে মানুষগুলো—হয়তো তুচ্ছ একটা ঘটনার বিবরণ দেবে বিশদভাবে। বুলটুর জ্বর হয়েছে কিম্বা মন্টুর পা ভেঙেছে, না হয় পড়ে গিয়ে খুকির কপাল ফেটেছে—তাছাড়া মুমূর্ষু ভাসুর তো সবচেয়ে ওপরে আছেনই।

ছোট বউ—ও ছোট বউ—ভাঙা ভাঙা ভেজা গলা রমানাথের। স্বরটা শোনাচ্ছে আর্তনাদের মত। নিজে তিনি কখনও ডাকেন না এমন করে।

দ্রুত হাতে খিল খুলে দেয় মঞ্জুলা। কেউ কোন কথা বলে না। মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে। হাঁ হাঁ করে কাঁদেন রমানাথ।

অরুণা শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন মঞ্জুলাকে। আঁচল দিয়ে নিজের মুখ চেপে ধরেন মাঝে মাঝে। মঞ্জুলার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন নীরব সান্ত্বনার মত। মাথা নিচু করে বুলটু আলো জ্বেলে দেয়। চোখের জল মুছতে মুছতে মন্টু অন্য দরজায় খিল খুলে দেয়।

সিঁড়ি দিয়ে কথা বলতে বলতে কারা যেন ওপরে উঠে আসছে।

মঞ্জুলা তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। কিছু বুঝতে পারে না। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাপস ফিরে আসছে মনে করে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওরা কারা? ওটা কি? ওরা অমন ধরাধরি করে কি নিয়ে আসছে ঘরের মধ্যে! দাঁতে দাঁত লেগে যায় মঞ্জুলার। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চায়। সাদা চাদরে স্ট্রেচারের ওপর তাপসের নিস্পন্দ দেহ। বিকৃত দগ্ধ মুখ। ভয়ঙ্কর।

অন্ধকার—একটানা মূক ভয়াবহ অন্ধকার। পৃথিবীটা দুলছে। কেউ নেই। কিছু নেই। বিকট চিৎকার করে মঞ্জুলা আছাড় খেয়ে পড়ে অরুণার ওপর।

কথা আসে না কারুর মুখে। সব ঠিক আছে। যেখানকার জিনিস সেখানে। কিন্তু সকালবেলাকার সেই ঘরখানাকে সন্ধ্যেবেলা একেবারেই অন্যরকম মনে হয়। স্ট্রেচারে তাপসের মৃতদেহ এই ঘরের সব কিছু যেন উল্টেপাল্টে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। মঞ্জুলাকেও।

বসবার ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে চোখের জল ফেলছে সেই ছোকরা চাকরটা। সে জানে এ ঘরের কলিং-বেল আজ আর কেউ বাজাবে না। তাপসের যত বন্ধু-বান্ধব সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে ম্লান ছায়ার মত উঠে আসছে ওপরে। দরজার বাইরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মেয়েরা ভেতরে ঢুকছে। সাবধানে ফুল রাখছে তাপসের দেহের ওপর। কথা বলছে না। দেখছে মঞ্জুলাকে।

হঠাৎ মঞ্জুলা মাথা তোলে। ভীত রুক্ষ অস্বাভাবিক দৃষ্টি। সে তাকায় প্রত্যেকের দিকে। জলে ঝাপসা হয়ে গেছে চোখ। যেন চিনতে পারে না চৌধুরী-রমাকে, মেনন-ললিতাকে, সান্যাল-পদ্মাকে—আর যারা এয়ার আফিস থেকে খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছে, তাদের কাউকেই।

আঃ—আলো নেবাও—আমি দেখতে চাই না—আমি দেখতে

পারবো না—অরুণার কোলে মুখ গুঁজে দুই হাত শক্ত করে মঞ্জুলা তবু তাঁকেই আঁকড়ে ধরে।

ভাঙা গলায় রমানাথ বলে ওঠেন, ওগো ওকে ভাল করে ধর—বিছানায় শুইয়ে দাও। শক্ত হও ছোট বউ—শক্ত হও!

কাছে কাছে থাকে বুলটু আব মণ্টু। ছোট মেয়ে দুটো ঘুম হয়ে গেছে। রমানাথ মঞ্জুলার আরও কাছে সরে বসেন। গায়ে ময়লা গেঞ্জিটাও নেই এখন। ছেঁড়া ধুতির কোণ দিয়ে মাঝে মাঝে চোখের জল মোছেন।

হাওয়ায় জানলাটা কখন বন্ধ হয়ে গেছে। খিল দেওয়া হয় নি বলে মাঝখানের দরজা থেকে থেকে শব্দ করে। ওদিকটা একেবারে শূন্য। ওদিকে এখন আর কেউ নেই বলেই বোধহয় দরজাটা বিকট আওয়াজ করে আছড়ে ভেঙে পড়তে চায় মঞ্জুলার মতই।

২৬শে আগস্ট : .৯৫৮

মঙ্গলবার সন্ধ্যা : কলিকাতা

॥ চোখ ॥

বিকেলের চাপা লালচে রঙ সামনের বড় বটের ছোট পাতার রূপটাই যেন পাল্টে দিয়েছে। হাওয়া দিচ্ছে একটু একটু। পাতা কাঁপছে। ডাল-পালার একটা মিষ্টি হালকা আওয়াজ কানে এসে লাগছে শিবনাথের। এপাশে জল, ওপাশে গাছ, আর সামনে বিরাট ফাঁকা মাঠ। তা ছাড়া মাথার ওপর খোলা আকাশ তো আছেই।

রোজই তো থাকে। দিনের পর দিন গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে শিবনাথ। হঠাৎ কখন চোখ তুলে পাশের পুকুরটার দিকে তাকিয়েছে। মাথার ওপর আকাশের কথা খেয়াল করে নি, তা হলে মাথা তুলে আকাশটাকেও একবার দেখে নিত বোধহয়।

আপিস থেকে বেরুবার পর সোজা বাড়ি ফিরে যেতে মন চায় না শিবনাথের। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে ক্লান্তি—নিদারুণ অবসাদ কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। দেহটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে। পা চলে না। কোনদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। কোন রকমে রোজকার অভ্যাস মত সোজা বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায় সে।

হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি। শিবনাথ এক পা এগোয় তো তিন পা পেছোয়। হঠাৎ এক সময়ে দেখে যে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে যেমনকার তেমন, যেখানে ছিল সেখানে।

অনেকক্ষণ গেল ঠেলাঠেলি করেই। ধুতিটা ফেঁসে গেছে। কার কঠিন কনুইয়ের ধাক্কা লেগেছে ঘাড়ে। টন টন করছে। বিরক্ত হয়ে অস্ফুট স্বরে আপন মনে কি একটা কথা উচ্চারণ করে শিবনাথ। পকেটটা অনুভব করে একবার হাত দিয়ে। পিছিয়ে আসে আস্তে আস্তে। বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে থাকে না। শার্টের হাতা দিয়েই কপালের ঘাম মুছে ফেলে।

তখন পুকুরটার দিকে সে তাকায়। এপারে ওপারে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে কয়েকজন লোক। নির্বিকার। একটা ছোট ছেলে ঢিল ছোঁড়ে। টুপ করে শব্দ হয়। কাঁপন লাগে জলে। বট আর নিমগাছের লম্বা সারি চলে গেছে অনেক দূর। হাওয়ায় পাতা ঝরে পড়ে। মাছ ধরতে ধরতে লোকগুলো মাঝে মাঝে মাথা তুলে তাকায়। মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে আর একটা লম্বা রাস্তা বেঁকে গেছে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। ও রাস্তায় মোটর গাড়ি যায় হুসহুস করে। পড়ন্ত বেলা। ম্লান রোদ। হাওয়ার খুব জোর। ঘাম শুকিয়ে যায় শিবনাথের।

পুকুরের রেলিঙে ভর দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ। পায়ের নিচে নরম ঘাস। সে মুখ নামিয়ে তাকিয়ে দেখে। বাস-ট্রামের শব্দ আসছে পিছন থেকে। শিবনাথ মুখ ফেরায় না। সেই পুরনো ক্লান্ত শহরটাকে আজ একেবারেই অন্যরকম লাগে তার চোখে। অনেকদিন পর জলে নেমে হাত-পা ছুঁড়ে মনের আর শরীরের সব অবসাদ দূর করে দেবার একটা তীব্র ইচ্ছা জাগে মনে।

জল মাঠ গাছ আর আকাশ। সেই পুরনো শহর। শহরটাই তাকে জড়ায় পাকে পাকে—কর্কশ অজগরের মত। জল মাঠ গাছ আর আকাশ দেখবার চোখটা বোধ হয় একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। ওরা আছে তার খুব কাছাকাছি—একেবারে আপিসের সামনে। কিন্তু তবু প্রত্যহ এদিকে এলেও সে দেখতে পায় না তাদের—দেখেও দেখে না।

পুকুরটার ঠিক ওপারে ভিড় জমেছে। কোন খেলা হচ্ছে বোধ হয়। এদিকে বাসের ভিড় কমে নি এখনও। সেই ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে লোকগুলো প্রাণের মায়া না করেই।

থমকে দাঁড়ায় শিবনাথ। বাসে চড়বার প্রবৃত্তি হয় না। পুকুরের ওপারে গিয়ে খেলা দেখতে ইচ্ছে করে। মনটা একটু তাজা হোক।

গায়ে একটু হাওয়া লাগুক। খোলা আকাশের নিচে ময়দানের মুক্ত হাওয়া! বাড়ি ফেরবার কোন তাড়া নেই।

পকেটে বেশী পয়সা নেই। কোনদিন থাকেও না। কিন্তু রীতিমত ক্ষিধে পায় শিবনাথের। সে এদিক-ওদিক তাকায়। চানাচুর কিম্বা ঘুঘনি—একটা কিছু হলেই হল। দু-এক আনায় পেট ভরে যায়। রাস্তায় পেট না ভরলে তার চলবে কেন!

একটা চীনেবাদামওয়ালা বসে আছে গাছের তলায়। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে দু-আনার এক ঠোঙা কেনে। বুদ্ধি করে একটু ঝাল-নুনও চেয়ে নেয়। চলতে চলতে চীনেবাদাম পকেটে ঢেলে ঠোঙাটা ফেলে দেয়, ঝাল-নুনটা থাকে হাতের মুঠোয়।

দূর থেকে বুঝতে পারে নি, কাছে গিয়ে শিবনাথের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। মেয়েদের হকি খেলা হচ্ছে। তাই এত ভিড়। আরও তাড়াতাড়ি সে চীনেবাদাম চিবোয়। বেশী করে ঝাল-নুন ফেলে মুখে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় গলা উঁচু করে খেলা দেখে।

কতকগুলি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ওদের মধ্যে দু-চার জন খাঁটি ইংরেজ আছে কি-না সে ঠিক বুঝতে পারে না। থাক বা না থাক তাতে তার কি। সে ওদেরই দেখে অবাক হয়ে।

এক দলের নীল জামা আর কালো হাফ প্যাণ্ট। রঙ সাদা! ছুটছে এদিক থেকে ওদিক। উদ্ধত যৌবন। নিটোল স্বাস্থ্য। চুল উড়ছে। হকি স্টিকের আওয়াজ হচ্ছে খটাখট। বাড়ির পর বাড়ি খেয়ে বলের গতি বাড়ছে।

শিবনাথের ক্ষিধে বেড়ে যায়। বাদাম ভাঙ্গে খুটুর খুটুর। শরীরের অবসাদ মুছে যায়। মনটাও তাজা হয়ে যায় হঠাৎ। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে সে মুখ বাড়ায়। ক্লান্তিহীন শরীর। বিদ্যুতের মত চঞ্চল। খিলখিল হাসির আওয়াজ। পায়ে বুট। মাঠের স্থির ঘাস চমকে চমকে উঠছে। ছুটে এসে ঝুঁকে পড়ছে কাঠের বলটার ওপর। সমস্ত শক্তি দিয়ে স্টিক তুলে আঘাত করছে—খট!

আর অদ্ভুত একটা গতি পাচ্ছে কাঠের সেই ছোট্ট বল। সেটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে শেষ বিকেলের থমথমে আলোয় হঠাৎ বুঝতে পারে না শিবনাথ। লক্ষ্যও স্থির রাখতে পারে না বলের ওপর। সে নিজেই বোধহয় একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে মেয়েদের আরও কাছে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে। একটা নেশা লাগে। বাদাম ফুরোয় না তখনও। হাত চলে সামনে। তাকে কেউ এখন লক্ষ্য করছে না বলেই সোজা মেয়েদের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবার সুযোগ পায়।

একটি মেয়ে একেবারে শিবনাথের কাছ ঘেঁষে ছুটে গেল। বল তখন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেছে অন্যদিকে। মেয়েটিও ছোটে সেদিকে। আঘাত খাওয়া বলের মত বিদ্যুৎ বেগেই। অন্য আর একজনের নাম ধরে যেন আর্ত চিৎকার করে, শার্লি—

ওপাশে আর একটি মেয়ে বল ধরে ফেলেছে তখন। বাড়ি মারছে না। এড়িয়ে গড়িয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। এপাশ ওপাশ থেকে তার স্টিকের ওপর স্টিক এসে পড়ছে—খটাখট। কিন্তু সে হাসছে। নাচাচ্ছে। খেলাচ্ছে। স্টিক নিয়ে সামনে পিছনে বল নিয়ে কৌশল দেখাচ্ছে বিপক্ষ দলকে। যেন সে নিশ্চিন্ত। যেন পরাজয় তাদের দলের জন্যে নয়।

শার্লি কাছে আসে শিবনাথের। ভরা যৌবন। মুখ লাল হয়ে উঠেছে ঘামে। মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। উৎসাহ দেয় দর্শকের দল। সকলের উত্তেজনা তাল পাকিয়ে যেন মেয়েটি ধরে রেখেছে হাতের মুঠোয়—হকিস্টিকের মাথায়। লাল জামা। সাদা হাফ প্যাণ্ট। চীনেবাদামের কথা শিবনাথ ভুলে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয় শার্লিকে। গোল মুখ। সোনালী চুল। অক্লান্ত। মিষ্টি হাসি খেলছে মুখে। বিপক্ষ দলকে দিশেহারা করে দেবার জন্যেই বোধ হয় হাত দুটো অনেক উঁচুতে তোলে। কিন্তু খট করে স্টিকের শব্দ হয় না। বলকে শার্লি আঘাত করে না। বিপক্ষ দল

সচকিত হয়ে উঠলেই সে আস্তে হাত নামায়। নিজের কাছেই বল রেখে স্টিক ঘোরায়। নিজেই ঘুরপাক খায় কয়েকবার, বিলিতী নাচের মত।

শিবনাথ দেখে হাঁটুর ঠিক নিচেই একটু ছড়ে গেছে মেয়েটির। সামান্য রক্ত জমেছে। মুখের তুলনায় হাঁটু অনেক হালকা। ধবধবে পরিষ্কার। নীল শিরা ফুলে উঠেছে। সাদা মোজা নেমে এসেছে ব্রাউন বুটের ওপর। বাঁ পায়ের বুটের ফিতে খুলে গেছে। খেয়াল নেই। হঠাৎ তলোয়ারের মত চকিতে ব্যাট ওঠে আর নামে। প্রাণপণ শক্তিতে মেরেছে শার্লি। কোথায় বল শিবনাথ দেখতে পায় না। জোরে হুইসেল বেজে ওঠে পরমুহূর্তেই। খিলখিল হাসির আওয়াজ আসে। গোল-গোল বলে মিষ্টি চিৎকার। শার্লি গোল দিয়েছে।

সরে গেছে শার্লি। চলে গেছে মাঠের ওদিকটায়। গোল পোস্টের কাছে গিয়ে জটলা করছে অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে। শিবনাথ এখনও তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। ঘাসের ওপর দিয়ে বলের মতই তার ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে ওদিকে। কিন্তু যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। পকেটে বাকি চীনেবাদামের কথা ভুলেই।

কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। খেলা শেষ হয়ে গেছে। ভিড় সরে যেতে আরম্ভ করেছে। ওই মেয়েরা পা মেলে বসে পড়েছে নরম ঘাসের ওপর। শুয়ে পড়েছে কেউ কেউ। পকেটে হাত দিয়ে চীনেবাদাম অনুভব করে শিবনাথ। চিবোতে ইচ্ছে করে না। ওখানে গিয়ে ওরও একটু গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করে। শার্লির হাঁটুর ঠিক নিচেই ছড়ে যাওয়া জায়গাটুকুর কথা মনে পড়ে।

হাওয়ার সোঁসোঁ শব্দ। শিবনাথের চুল ওড়ে। গৈরিক আলো ম্লান হয়ে হয়ে এসেছে। দূর থেকে অন্ধকার আসছে আস্তে আস্তে সন্তর্পণে! তবু যতক্ষণ দেখা যায় উদ্ধত-যৌবনা চঞ্চল মেয়েদের দিকে সে তাকিয়ে থাকে।

শরীরের ঠাণ্ডা রক্ত হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ময়দানের এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জোরে জোরে হাঁটতে ইচ্ছে করে। একটা স্টিক পেলে শিবনাথও এখন সমানে ছুটতে পারে ওদের মত। মুহূর্তে মুহূর্তে আওয়াজ তুলতে পারে খটাখট। মিষ্টি সুবাসও ছড়িয়ে যেতে পারে—যৌবনের সুবাস।

পিছন ফিরে আবার বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে শিবনাথ এগিয়ে যায়। আস্তে আস্তে নয়—বেশ জোরে জোরেই। ক্লান্তিতে নয়—যৌবনের দাহেই। লাল জামা, সাদা হাফ প্যাণ্ট, মিষ্টি আমেজ, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপা শরীর আর ছড়ে যাওয়া জানু। মনে মনে সে তাকে আঁকড়ে ধরতে চায় ময়দানের মাঝখানেই।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে শার্লি এসে দাঁড়িয়েছিল তার ঠিক সামনে। হলদে রঙের একটা মালাও যেন ছিল গলায়। লাল জামার নিচে সাদা পাতলা আর একটা জামা। গলার কাছে অনেকখানি অংশ অনাবৃত। টানতে জানে ওরা—কাছ থেকে কাছে। ক্লান্তি অপ-সারণের কৌশল জানে। খট করে আওয়াজ তুলে বিষাদকে পাঠিয়ে দেয় একেবারে ময়দানের অন্যপ্রান্তে—অন্ধকারে। ঘন সোনালী চুলের ঝাপটায় অবসাদ হারিয়ে যায়। গায়ের সুবাসে নেশা জাগে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা চোখের চাউনিতেই ভুলিয়ে দেয়। চীনেবাদামের রাশি পকেটে পড়ে থাকে যেমনকার তেমন।

চলতে চলতে মাথার ওপর আকাশের কথা আর মনে থাকে না শিবনাথের! গাছগুলোর দিকেও সে তাকিয়ে দেখে না। সিমেন্টের রেলিঙ-ঘেরা পুকুরের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে এলেও জলের কথা এবার আর খেয়াল করতে পারে না। শুধু শার্লি, হকি-স্টিক, খিলখিল হাসি, ছোট হাতকাটা জামা আর হাফ প্যাণ্ট আর ছড়ে যাওয়া জানু। আশ্চর্য চোখ বটে শিবনাথের। কখনও দেখে। কখনও দেখে না। কী দেখে—কাকে দেখে—কেমন করে দেখে—কোন ঠিক নেই।

চৌরঙ্গির সব আলোগুলো জ্বলে উঠেছে তখন। রাস্তার মোড়ে বড় ঘড়িটা জ্বলজ্বল করছে। সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট। শিবনাথ স্পষ্ট দেখতে পায়।

ভিড় নেই বটে এখন বাসে। ফাঁকা বাস। মিনিটে মিনিটে আসছে। জোরে জোরে হর্ন দিচ্ছে। কর্কশ স্বরে চিৎকার করছে কণ্ডাক্টর যাত্রীদের উদ্দেশে। যদিও দরকার নেই, হেলে দুলে আস্তে আস্তে উঠলেই চলত—তবু গায়ের জোরে হ্যাণ্ডেল চেপে লাফ দিয়ে শিবনাথ বাসে ওঠে। যেন ভিড় থাকলেও এবার আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যেত না। সে সকলকে একহাতে ঠেলে উঠে পড়তে পারত ঠিক। মনে মনে হাতের মুঠোয় হকি-স্টিক নাচায় সে, আর ঠকাঠক কাঠের শক্ত বলটাকে নিয়ে যায় এদিক থেকে ওদিক। মুঠো আপনি শক্ত হয়ে ওঠে, পেশী দৃঢ় হয়ে ওঠে। পকেটে পড়ে থাকা চীনেবাদা নড়তে চড়তে এখনও কিন্তু খুটুর খুটুর শব্দ করে। সেগুলো খেতে গিয়েও খায় না শিবনাথ—ফেলতে গিয়েও ফেলে না। বাস থেকে আর একবার বাইরে তাকায়। মেয়েরা বোধহয় এখনও বসে আছে ঘাসের ওপর।

গলির মুখে দাঁড়িয়ে শিবনাথের তাজা মনটা হঠাৎ আবার নিস্তেজ হয়ে যায়। পা চলে না। ছুটির ঠিক আগে আগে হাতের কাছের মোটা ফাইলটা সরিয়ে দিতে যত কষ্ট হয়, এখন ঠিক ততই কষ্ট হয় এক একটি পা ফেলতে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ভুল করেছে সে। বিরক্তিতে কপালটা কুঁচকে যায়। আর কিছুক্ষণ ময়দানে ঘুরে বেড়ালে কি ক্ষতি হত কার। তাকে নিয়ে ভাবনা করবার সময় আছে নাকি বেলার।

বেলার কথা মনে হতেই যেন বার্ধক্য নেমে আসে শিবনাথের দেহে। ক্লান্ত শীর্ণ একটি মুখ। হাসতে জানে না। এ ঘর থেকে ও ঘরে যায়। দুটি তো মোটে ঘর। কিন্তু তবু চলতে যেন কষ্ট হয়

তার। কথা বলে ম্লান স্বরে থেমে থেমে। আধ-ময়লা মিলের শাড়ি। কোথাও ছেঁড়া—কোথাও হলুদের দাগ। এই পৃথিবীতে যেন অভাবের কথা ছাড়া আর কোন কথা নেই। কথায় কথায় বিরক্তি। অভিযোগ। দৈন্য আর ক্লান্তি। কিসের আকর্ষণে ঘরে ফিরে আসবে শিবনাথ?

ছোট্ট গলি। স্যাঁতস্যাঁতে। হাওয়া নেই। দরদর করে ঘাম ঝরে। ল্যাম্প-পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আবার একটা চীনেবাদামের খোলা শব্দ করে ভেঙে শিবনাথ মুখের মধ্যে ফেলে দেয়। মাথা ঝিম-ঝিম করে। রাস্তাটা কাঁপে নাকি! ক্লান্ত হাতে সে কড়া নাড়ে।

যাই—কর্কশ তীক্ষ্ণ গলার স্বর। এত জোরে সাড়া দেবার দরকারই বা কি! কালা নাকি শিবনাথ। গলিটাও বোধহয় চমকে ওঠে।

এই যে, শিবনাথ মাথা তোলে না কিন্তু অন্ধকারে তাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে বেলা বলে যায় বেশ জোরে-জোরেই, কেমন মানুষ তুমি? একটু আক্কেল নেই? আপিস তো ছুটি হয় সেই কখন—

বিরক্ত হয়ে শিবনাথ বলে ওঠে, ঘরে ঢুকতে দেবে না নাকি?

ও মা, সে কি কথা! কী কথার ছিরি মশাইয়ের! এস এস—এত রাত করে ফিরলে ভাবনা হয় না মানুষের?

রাত কি সাধ করে করি, শিবনাথের স্বরটাও সাংঘাতিক রকম তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, বাসে চড়বার ধকল তো জানা নেই, তাই চেঁচাও ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে—

লজ্জা পেয়ে বেলা থেমে যায়। মানুষটা ঘরে ফিরল এতক্ষণ পর খেটে খুটে। দরজা আগলে অমন করে কৈফিয়ত চাওয়া ঠিক হয় নি। বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যাচ্ছে নাকি বেলার আজকাল। তাড়া-তাড়ি সে পিছিয়ে আসে। ঘরে ঢোকে শিবনাথ। সে যায় তার পেছন পেছন। তারই ছায়ার মত।

ভন্তু পড়ে আছে পায়া-ভাঙা তক্তপোশের ওপর। শিবনাথকে দেখে লাফিয়ে উঠে বসে। বাবার কাছে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু বেলা বাধা দেয়। তাকে ধরে ফেলে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, ওঠে না ভন্তু—ওঠে না। ছি। লক্ষ্মী সোনা আমার—

ম'র কোলে ছটফট করতে করতে ভন্তু নালিশ জানায় ধরা গলায়, ভাত দেয় নি—তকারি দেয় নি—মা কিছু দেয় নি, ও বাবা—বাবারে—

শিবনাথ কথা বলে না। একটা কঠিন জরা যেন অসহ্য যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে তাকে। আস্তে আস্তে সে বসে পড়ে সেই তক্ত-পোশের ওপর। ভন্তুর কথা শোনে না। ফিরে তাকায় না তার দিকে। বসে বসেই গায়ের শার্ট খুলে ফেলে শিবনাথ। ঝুরঝুর করে চীনেবাদাম ছড়িয়ে পড়ে মেঝের ওপর। আর ভন্তু লাফিয়ে নামে মাটিতে। ক্ষিপ্র হাতে বাদাম কুড়োতে বসে যায়।

ওরে ও দস্যি ছেলে, করিস কি, দুই হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি বাদাম-গুলো হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয় বেলা, চীনেবাদাম এনেছ ওর জন্যে? বলি, মারবে নাকি রোগা ছেলেটাকে?

ভন্তু চিৎকার করে কাঁদে। লাফায়। হাত-পা ছোঁড়ে। মারতে চায় বেলাকে। কোন কথা শোনে না। আর শিবনাথ? প্রথমে নিজের মাথা শক্ত করে চেপে ধরে দুই হাতে। কান দুটোও চেপে ধরে। কিন্তু তার কঠিন হাত ভেদ করেও ভন্তুর চিল-চিৎকার কানে প্রবেশ করে।

অসহায়ের মত শিবনাথ তাকায় এপাশে-ওপাশে। ফাটা দেওয়াল। ছোট ঘর। জিনিসে ঠাসা! সস্তা কাঠের ছোট একটা আলমারি। তার ওপর ভাঙা গেলাসে ঠেস দিয়ে রাখা একটা আয়না। কয়েক বছর আগে চৌরঙ্গির এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে দরাদরি করে পুরো এক টাকা দিয়ে সে নিজেই কিনেছিল। ঘরের চারদিকে কাপড়ের পুঁটলি। ছেঁড়া শাড়ি। লেপ। কাঁথা। দু-

একটা চটা ওঠা ট্রাঙ্ক। স্তূপাকার পুরনো বাংলা খবরের কাগজ। একটা বইয়ের শেলক্—পাঁজি রামায়ণ মহাভারত আর ছিন্ন মাসিক পত্রিকার গাদায় বিপর্যস্ত। দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে তাক। তেলের শিশি। সাবান। সিঁদুর-আলতা। সেলুলয়েডের একটা পাউডারের কৌটাও আছে একদিকে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শিবনাথ সারা ঘরখানাকে দেখে নেয় একবার। আর তখন একান্ত অনিচ্ছায় হলেও বেলার দিকেও চোখ পড়ে তার।

কপালে ঘাম। মুঠিতে চীনেবাদাম। হাতে দু গাছি লাল কাচের চুড়ি। গলায় সরু একটা হার। মাথায় দোকান থেকে খুচরো কিনে আনা নারকেল তেলের উগ্র গন্ধ। ভন্তুকে চুপ করাবার প্রাণপণ চেষ্টায় দিশেহারা। ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে দেখছে শিবনাথের দিকে। সে চোখ নামিয়ে নেয়। ধুতি দিয়ে মুখের ঘাম মোছে। হাতপাখাটা ট্রাঙ্কের ওপর থেকে তুলে নিয়ে দ্রুতহাতে বাতাস খায়। চোখ দুটো বুজেই থাকে সে।

ভন্তুর যে জ্বর হয়েছে সে-কথাটা এতক্ষণ শিবনাথ ভুলে ছিল। আপিসে বেরুবার আগে বারবার বলে দিয়েছিল বেলা, ফেরবার সময় ছেলেটার জন্যে যাহোক সস্তা একটা কিছু কিনে আনতে। আপিসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথাটা যে তার মনে পড়ে নি তা নয়, কিন্তু পয়সার কথা ভেবে পেছিয়ে গেছে। প্রায়ই সংসারের জন্যে টাকা ধার করতে হয় বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে। ছেলের খেলনা কেনবার টাকার কথা কাউকে বলতে তার বেধে যায়। মাসের শেষে দু-এক টাকাও কারুর কাছ থেকে পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যায় তাহলে ভন্তুর খেলনা কিনে সে টাকা খরচ করতে শিবনাথ রাজী নয়। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনবার ভাবনা তাকে সবচেয়ে আগে ভাবতে হয়। তাই চীনেবাদামের ব্যাপারে সে প্রতিবাদ করে না বেলার কথায়।

ছেলেটার চিল-চিৎকার থেমেছে। চীনেবাদাম জানলা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে বেলা। ভন্তুকে বোঝাচ্ছে, জ্বর সেরে গেলেই

কিনে দেব—এই দেখ ভন্তু—এত্ত বাদাম—চানাচুর। কাল ঠিক তোকে ভাত খেতে দেব—এত্ত ভাত—বিরক্তি নেই বেলার মুখে। ছেলেকে সে বুকে চেপে ধরে। আদর করে। ভোলায়।

তবুও ভন্তু একেবারে চুপ করে না। শিবনাথের দিকে তাকিয়ে থেকে ফোঁপায়। বাপের কোলে চড়ে আদর খাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে। বেলা তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে এখন সাহস পায় না। স্বামীর মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হোক। আলমারির মাথা থেকে একটা ঝুমঝুমি বের করে তার হাতে দিয়ে বলে, নাও এবার শোও চুপ করে লক্ষ্মী সোনা—বাবাকে বিরক্ত করবে না—কেমন?

ঝুমঝুমির ঝুমঝুম আওয়াজে শিবনাথ মাথা তুলে বলে, ওটা কোথা থেকে এল?

বেলা বলে, দুপুরবেলা ফেরিওয়ালা এসেছিল। ছ-আনা দিয়ে কিনেছি। যা জেদ ধরেছিল দস্যি ছেলে—

আরও জোরে শিবনাথ হাতপাখা নাড়ে। নিজে ভন্তুর জন্যে কিছু আনতে পারে নি বলে একটা চাপা অতৃপ্তি খোঁচা দিচ্ছিল, ঝুমঝুমিটা দেখে কঠিন চেহারাটা একটু কোমল হয়। আর একবার মুখে ধুতি বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, ছ-আনা পেলে কোথায়? আমি তো মোটে চার আনা রেখে গিয়েছিলাম আজ—খুশির আভা ফুটে ওঠে বেলার মুখে, আজ আমি রাজরাণী—ছ-আনা? কত চাও তুমি? এখনও পুরো পাঁচটি টাকা আছে আমার কাছে—

পেলে কোথায় তাই বল না?

আজকের জন্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে বলে কবে থেকে পয়সা জমাচ্ছি আমি—

আজ কি? শিবনাথের হাতের পাখা থেমে যায়।

ঘাড় ঘুরিয়ে রসিকতা করে বেলা, এখন নয়। রাত্তির বেলা বলব। তখন শুনো। এখন—দাঁড়াও গামছাটা এনে দি—কলতলায় গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এস দেখি।

যা চেঁচাতে শুরু করল ভন্তুটা—

কোনদিক যে সামলাই—সুযোগ বুঝে ছেলেকে সাবধানে আবার খাটে শুইয়ে দেয় সে। কলতলায় ঘটি আর বালতিটা ঠিক করে একটা গামছা এনে দেয় শিবনাথের হাতে।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় শিবনাথ। পুরো পাঁচ টাকা আছে বেলার কাছে। কেন তিল তিল করে টাকা জমিয়ে নিজের কাছে রেখেছে সে কথা জানবার জন্যে মোটেও সে ব্যস্ত হয় না। টাকা যে বাড়িতে আছে তাই ঢের। বাজার হবে, ভন্তুর ওষুধ আসবে। আপিসের কারুর কাছে কয়েকটা দিন মুখ ফুটে আর টাকা চাইতে হবে না। আবার জোরে জোরে পাখা চালায় শিবনাথ। ভন্তুর কাছে সরে আসে। তাকে আদর করে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভন্তু তখন বাজিয়ে চলেছে সেই ছ-আনা দামের ঝুমঝুমি—ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম—

বাবা, আমাকে একটা ভাল্লুক কিনে দেবে ?

দেব বাবা, স্নেহ উপচে পড়ছে শিবনাথের চোখে-মুখে।

আর একটা কুকুর কিনে দেবে—ভৌ ভৌ—

দেব !

আর একটা রেলগাড়ি কিনে দেবে—পি—ঝিকঝিক—

হ্যাঁ।

মোটর ? ভোঁ—ও—ও—

শিবনাথ হেসে বলে, দেব।

কাল দেবে—পরশু দেবে—তরশু দেবে—নরশু দেবে—না বাবা ?

হ্যাঁ।

একটা ঘুড়ি—ভন্তু কাশে খক খক খক।

ব্যস্ত হয়ে শিবনাথ ঝুঁকে পড়ে। ভন্তুর দেহের তাপ পরীক্ষা করে, কাশিটা তো ভাল মনে হচ্ছে না। এখনও গায়ে বেশ জ্বর আছে দেখছি—

দূর, শীর্ণ ঠোঁটে হালকা হাসি খেলিয়ে শিবনাথের ভাবনাটা দূর করে দিতে চায়—সর্দি জ্বর। কাশি তো একটু থাকবেই। বাসক সিরাপ খাওয়াচ্ছি না? এবার জ্বর ছেড়ে যাবে। কাশিও কমবে দেখো—

গেঞ্জি খুলতে খুলতে শিবনাথও কাশে, একটা ডাক্তার দেখাতে পারলে ছেলেটা সেরে যেত এতদিনে—একটা বুক ঠেলে আসা দীর্ঘনিশ্বাস যেন সে জোর করেই চেপে যায়।

দূর, বেলা হাসিমুখে বলে, সর্দি জ্বরে আবার কেউ ডাক্তার ডাকে নাকি? তোমার যেমন কথা—

শিবনাথ তাকিয়ে দেখে বেলার দিকে। রোগা মুখ। চোখের কোনায় কালি জমেছে। সরু সরু হাত। কি খায় না খায় কে জানে। সে আপিসে বেরিয়ে যাবার পর হয়তো বেশী করে ছেলের দুধ কিনবে বলে নিজে আধ পেটা খেয়ে কাটায়।

থেমে থেমে শিবনাথ বলে, তোমার শরীরটাও খারাপ হচ্ছে দেখছি, আস্তে হাওয়া খায় সে. দিনরাত ঘরে বসে থাক, আলো নেই—হাওয়া নেই—এই ঘরে বসে সারাদিন কাটালে বাঁচতে পারে নাকি মানুষ?

ওমা, সে কি কথা, শিবনাথের কাছ থেকে পাখা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে হাওয়া করতে করতে আবার হাসে বেলা, বাড়ির বউ দিন দুপুরে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় নাকি? তোমার যেমন কথা—ভন্তু ঝুমঝুমি বাজায় ঝুম ঝুম!

এবার থেকে শনিবার—রবিবার আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে বেড়াতে যাব—

কোথায় যাবে বাবা? চিড়িয়াখানায়? ও বাবা, বাঘ দেখব, ভন্তু উঠে বসে, সিংহ—বাঁদর—বেড়াল—মিয়াও!

বেলা শিবনাথকে তাড়া দিয়ে বলে, এবার যাও, মুখ-হাত ধোও। রাস্তার ধুলো-বালি নিয়ে এতক্ষণ বসে থাকতে প্রবৃত্তি হয় তোমার—কথা শেষ করেই বেলা উঠে যায় রান্নাঘরে। একটা মিষ্টি গন্ধ

শিবনাথের নাকে এসে লাগে। আর আস্তে ঝুমঝুমি নাড়ে ভন্তু। তারই মিষ্টি মৃদু আওয়াজ।

শিবনাথ গামছা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ায়, বাবা ভন্তু, একটু শুয়ে থাক চুপ করে—আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি—কেমন ?

লক্ষ্মী ছেলের মত মাথা নেড়ে ভন্তু বলে, হ্যাঁ।

আপিস থেকে বাড়ি ফিরে শুধু এক কাপ চা খায় শিবনাথ। আর কিছু খেতে যে একেবারেই ইচ্ছে করে না তা নয়, কিন্তু কোন লাভ হয় না তাতে। শুধু পয়সা খরচ আর রাত্তিরে ক্ষিধেও মরে যায়। ছুটির দিনে শিবনাথের কথা না শুনেই নিমকি কিম্বা পাঁপড় ভেজে দেয় বেলা। রোজ রোজ খালি পেটে শুধু চা খেলে পেটের অবস্থা কাহিল হয় না মানুষের !

গা হাত-পা ভাল করে মুছে মাথায় চিরুনি চালায় শিবনাথ। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার শরীর ঘামে তার। ভন্তুর পাশে বসে চায়ের জন্যে অপেক্ষা করে সে। অনেক চিনেবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে গলাটা শুকিয়ে গেছে একেবারে।

শুধু চা নিয়ে নয়, বেলা আসে আরও একটা বাটি হাতে নিয়ে। ভন্তুর দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার জন্যেও নিয়ে আসছি—ছটফট করো না—

আজ ছুটির দিন নয়। তাই অবাক হয়ে শিবনাথ বলে, এসব আবার কি ?

আজ তো এসবেরই দিন, হাত বাড়িয়ে ছোট একটা পাথরের বাটি আলমারির ওপর থেকে টেনে নিয়ে বেলা চন্দনের ফোঁটা দেয় শিবনাথের কপালে। ভন্তুর মুখে কথা নেই। মার কাণ্ড দেখে সে মৃদু মৃদু হাসে আর থেকে থেকে ঝুমঝুমি নাড়ে।

কিছু বুঝতে না পেরে শিবনাথ বলে, ব্যাপারটা কি বল না ছাই। হেঁয়ালি করছ কেন সেই তখন থেকে ?

দুষ্টুমি ভরা মুখে বেলা বলে, হেঁয়ালি বইকি, মানুষের জন্মটা তো হেঁয়ালিই রয়ে গেল—আজ জন্মদিন না তোমার ?

বিস্ময় ফুটে উঠে শিবনাথের মুখে। তার দৃষ্টির আকস্মিক পরিবর্তন বেলারও চোখে পড়ে। হাসতে হাসতে পায়সের বাটিটা স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে সে বলে, খাও।

সকালবেলা বল নি যে ?

রাত আটটায় জন্মলগ্ন তোমার। আগে থেকে বলব কেন? তা হলে আর মজা হল কোথায় ?

পায়সের বাটি হাতে নিয়ে ঠায় বসে থাকে শিবনাথ। ভিজে-ভিজে চোখ। হাসি-হাসি মুখ। অনেকক্ষণ ধরে বেলাকেই সে দেখে। কপালে ঘাম। হাতের মুঠিতে পাখা। জোরে জোরে নাড়ছে। তুগাছি লাল কাচের চুড়ি। হাতের কাপনে টিনটিন শব্দ করছে। গলায় সরু একটা হার। মাথায় নারকেল তেলের উগ্র গন্ধ।

গোটা ময়দানটাই হঠাৎ আবার শিবনাথের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড় বটের ছোট পাতায় চাপা লালচে রঙ। স্থির পুকুরের জলে অল্প একটু কাঁপন। আর আকাশ। কখনও মেঘ থমথম। কখনও চিকন আলোর হাসি। শুধু জল মাঠ আর আকাশ।

শিবনাথের তুই চোখ যদিও তখন একেবারেই বোজা।

ভস্তর ঝুমঝুমি বাজছে, ঝুম ঝুম ঝুম !

২০শে সেপ্টেম্বর : ১৯৫৮
শনিবার সকাল : কলিকাতা

।। চেহারা ।।

বাড়ি ফিরতে দেরি হল নীলিমার।

শরতের ভিজে ভিজে সন্ধ্যে। দূরে একটু-একটু কুয়াশা জমেছে কি জমে নি বোঝা যায় না। গলির মোড়ে আলোটা এখনও জ্বলে নি। বোধ হয় আবার খারাপ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে জ্বলে না। কখনও কখনও রাত্তিরে শোবার ঘরের পাশে ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীলিমা দেখে দপ-দপ করে ওই আলোটা কাঁপে। তারপর যেন দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ভয় পেয়ে হঠাৎ নিবে যায়।

কুণ্ডলী পাকিয়ে একটা কুকুর শুয়ে আছে গেটের কাছে। ট্যাক্সির জোরালো আলোয় চোখ পিটপিট করতে করতে উঠে দাঁড়াল। তার দিকে তাকিয়ে নীলিমা ড্রাইভারকে বলল, রোকো। একটু তাড়াতাড়ি নামল ট্যাক্সি থেকে। নামতে গিয়ে শাড়ি বেধে গেল দরজার খাঁজে। ভাড়া চুকিয়ে নীলিমা আস্তে গেট খুলল। এতটুকু শব্দ না হলে সে বেঁচে যায়। পা টিপে টিপে মাথা নামিয়ে সোজা উঠে যায় ওপরে। অপরেশ দেখতে পাবে না—বুঝতে পারবে না সে কখন ফিরেছে। চোখে-মুখে জল দিয়ে চাকরের সঙ্গে দু-একটা দরকারী কথা বলবে শুধু। জেনে নেবে অপরেশ কখন ফিরেছে আজ।

বাইরের ঘরে অনেক লোক। জোরে জোরে কথা বলছে অপরেশ। কোন জটিল মামলার বিবরণ বোধ হয়। নিলীমার পায়ের শব্দ না হলেও ট্যাক্সির আওয়াজে অপরেশ তাকিয়ে আছে বাইরের দিকেই। নীলিমাকে দেখছে। এখন নিশ্চয় ডাকবে না—কথাও বলবে না। বাইরের ঘরে লোকজন নিয়ে বসে থাকলে অপরেশ যেন চিন্তেই পারে না নীলিমাকে। কথা বলবে ওদের বিদেয় করে ভেতরে এসে। কিম্বা খাবার সময়। কিম্বা শোবার ঠিক আগে।

যখন চাকরটাও শুতে চলে যাবে তখন। জানতে চাইবে কোথায় গিয়েছিল নীলিমা—আর ট্যাক্সি চড়ে একা ঘুরে বেড়ানো যে এ বাড়ির নিয়ম নয় সেকথাটাও কর্কশস্বরে আর একবার নতুন করে তাকে মনে করিয়ে দেবে।

নিয়ম—কথাটা মুখ দিয়ে যদিও উচ্চারণ করবে না অপরেশ। তার ভাষা এত স্পষ্ট নয়। সে কথা বলে রেখে ঢেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—বলতে গিয়ে আরও পাঁচজনের নিন্দে করে বুঝিয়ে দেয়, কোন কাজটা মেয়েদের পক্ষে শোভন আর কোনটা অশোভন। কথা শুনতে শুনতে নীলিমার মনে হয়, তার নিজের চলাফেরা রীতিমত অশোভন মনে হয় অপরেশের। আর সে দেখতে পায় এ বাড়ির চারপাশে নিয়মের একটা কঠিন বেড়াজাল পাতা আছে।

থাক। নিয়ম ভাঙার এতটুকু উৎসাহ নেই নীলিমার আজকাল। বরং নিয়ম মেনে চলবার মধ্যে এক অদ্ভুত তৃপ্তির স্বাদ সে পায়। খানিকটা নির্জনতাও। তখন শরতের ঠাণ্ডা সকালের হালকা রোদ যেন মুঠো করে ধরতে চায়। নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টিতে। রাস্তা ধুলো, গাছ মাটি—সব কিছুর মধ্যেই একটা নিবিড় নিয়মকে অনুভব করে নীলিমা। অপরেশকেও তেমনি নিয়ম বলে মনে হয়। সকাল থেকে রাত অবধি তার কথায় কাজে আশ্চর্য মিল খুঁজে পায়। তখন তাকে তার সমস্ত জড়িয়ে মেনে নিতে এতটুকু দ্বিধা হয় না নীলিমার।

বিয়ের পর প্রথম প্রথম কুমারী জীবনের অভ্যাসের জন্যেই কতকগুলো অসতর্ক এলোমেলো মুহূর্ত আসত। জোরে হাসত নীলিমা। স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক গতিতে আসত এঘর থেকে ওঘরে। অপরেশের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাবার জন্যে একটা সহজ তাগিদ অনুভব করত মনের মধ্যে।

কিন্তু সময় নেই অপরেশের। কাজের চাপ। লোকজনের ভিড়। আর সে-সব ছেড়ে নীলিমাকে নিয়ে মাতামাতি করবার তেমন উৎসাহও

নেই অপরেশের। কাজের চাপ। লোকজনের ভিড়। আর সে সব ছেড়ে নীলিমাকে নিয়ে মাতামাতি করবার তেমন উৎসাহও নেই অপরেশের। সেটা বোধ হয় তার দিক থেকে একেবারেই নিয়ম বিরুদ্ধ।

অপরেশ বলতো, বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে কোনও লাভ নেই। ঘরে থাকলেই সংসারের শ্রী বাড়ে আজকালকার মেয়েদের ঘরে একেবারেই মন বসে না বলে সংসার এত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে—

আরও অনেক কথা বলতো অপরেশ। যেসব কথা নীলিমার কানে নতুন লাগত। ভুল হত কথায় কথায়—তখনকার চলায় ফেরায়। অপরেশ সংশোধন করে দিত রূঢ় ভাষায়। নতুন বিয়ের কথা না ভেবেই।

হাওয়ায় জানলার হলদে পর্দা ছটফট করে। কাছাকাছি সব বাড়ির আলো নিবে যায় এক এক করে। শুধু পাশের বাড়ি থেকে জলের ছড়ছড় শব্দ ভেসে আসে আর কাঁসার বাসনের ঠংঠং আওয়াজ। খট খট শব্দ করে কে খিড়কির দরজা বন্ধ করে। খুব জোরে বড় রাস্তার ওপর দিয়ে একটা মোটর গাড়ি বেরিয়ে যায়। ছেড়ে ছেড়ে হাই তোলে নীলিমা। চুপচাপ তাকিয়ে থাকে অপরেশের দিকে। একা একা শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না।

শোবে না?

অপরেশ মাথা তুলে তাকায়। চোখে মুখে বিরক্তি। ঘন ঘন সিগারেট টানে। কথা বলে না। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, আবার ক্ষিপ্র হাতে মোটা আইনের বইয়ের পাতা ওল্টাতে থাকে। কিন্তু আর মন দিতে পারে না বইয়ের পাতায়। একটু পরে উঠে ঢকঢক করে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খায়। তারপর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে টক করে আলো নিবিয়ে বিছানায় চলে আসে অপরেশ।

দেখ, পাশ ফিরে ঠাণ্ডা গলায় সে থেমে থেমে বলে, কাজ করবার সময় আমাকে বিরক্ত করো না—

কথা শুনে চমকে উঠে নীলিমা, অনেক রাত হল যে।

হোক। আমি ঠিক সময় হলেই শুতাম।

বাঃ, সারা রাত জেগে থাকলে অসুখ করবে না?

গলার স্বর রীতিমত উষ্ণ হয়ে উঠে অপরেশের, এখনও বারোটা বাজে নি। এই উঠতির সময় বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলে? সংসারের খরচ দিনে দিনে বাড়ছে না কমছে? কত হাজার উকিল এখন আছে কলকাতা শহরে। তাদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কি সোজা কথা? তুমি তো শুধু বাইরে ঘুরে বেড়াবার কথা ভাব—আমাকে আগে কাজের কথা ভাবতে হয়—

নীলিমা বলে, জানি।

অন্ধকারে অপরেশ দেখতে পায় না, নীলিমার চোখের পাতা থরথর করে কাঁপে। ভিজে ওঠে। ঘুমের মৃদু আমেজ মিলিয়ে যায় চোখ থেকে। আর রাতটাও হঠাৎ যেন শুষ্ক রুক্ষ হয়ে ওঠে। জানলার পর্দা আর ছটফট করে না তখন। বোধ হয় অস্বস্তিতে স্থির হয়ে যায়। বাইরের হাওয়াও এইমাত্র দাপাদাপি বন্ধ করেছে। ক্লান্ত অপরেশ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর নীলিমার চোখে ঘুম আসে না কিছুতেই। সে জেগে থাকে। অনেকক্ষণ।

কিন্তু সেটা হত প্রথম প্রথম। বিয়ের পর-পর। এখন খেতে বসেই ঘন ঘন হাই তোলে নীলিমা। তার আগে বই পড়ে। চা খায় কাপের পর কাপ। অপরেশের ফরমায়েশ মত নিচে বসবার ঘরে মক্কেলদের চা পাঠিয়ে দেয়। রাত দশটা সাড়ে দশটা বাজে রোজ। কোন কোন দিন এগারোটা। যতক্ষণ অপরেশ সকলকে বিদায় করে ওপরে না আসে ততক্ষণ ক্ষিধে পেলেও সে খায় না। ঘুম পেলেও ঘুমোয় না।

অপরেশ কাজ চুকিয়ে ভেতরে এসে বলে, এখনও খাও নি?

না।

কি আশ্চর্য, দেখ আমার এত দেরি হয়—খেয়ে নিলেই তো পার। রোজ রোজ এত রাত করে খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে—

তোমারও তো হবে।

একটু বিরক্ত হয়ে কথা বলে অপরেশ, আমার অভ্যাস আছে। আমার ভাবনা না ভেবে তুমি নিজের ভাবনা ভাব। শেষে অসুখ হলে সব কাজ ফেলে আমাকে ডাক্তারের বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। যা কাজের চাপ এখন—দেখতেই তো পাও একেবারেই সময় নেই—

অপরেশের খাবার সাজাতে সাজাতে মুখ নামিয়ে নীলিমা বলে, তোমাকে ভাবনা করতে হবে না। কোন অসুখ হবে না আমার।

মুখে তাকে আগে খেয়ে নিতে বলে বটে অপরেশ কিন্তু নীলিমা জানে যদি সে সত্যিই কোনদিন আগে খেয়ে নেয় তাহলে তার মুখ থেকে অদ্ভুত ধরনের কাটা কাটা কথা বেরিয়ে আসবে ঠিক। না, স্পষ্ট ভাষায় নীলিমাকে অপরেশ কিছুই বলবে না—শুধু দু-একটা গল্প শোনাবে—যার সার কথা হল ধৈর্য আর সহনশীলতার দিক থেকে আগেকার মেয়েদের তুলনায় এখনকার মেয়েরা কত পিছিয়ে আছে।

তাদের শুধু বাইরে মন। সংসারের ওপর নিবিড় কোন টান নেই। স্বামীর ওপর প্রগাঢ় আকর্ষণ তো নেই-ই। বাইরের চাকচিক্য বাড়ছে কিন্তু ভেতরের সে গভীরতা নেই। তাই সংসারটাও হয়ে উঠছে খোলা একটা মাঠের মত। শুধু কথার ধুলো-বালি আর তর্কের ঝড়—অলীক শিক্ষার বড়াই আর প্রচলিত রীতি ভেঙে ঝকমকে পশ্চিমের ব্যর্থ অনুকরণের একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা। ভাবুকের মত স্বরে দরদ আর উগ্র একটা সুর কৌশলে মিশিয়ে দেয় অপরেশ। এসব কথা শুনতে ভাল লাগে না নীলিমার। কিন্তু সে চুপ করে শোনে। হাই তোলে। কথা বলে না।

আজ একটু সকাল-সকাল অপরেশ ভেতরে চলে আসে। এখনও কেউ বাইরের ঘরে বসে আছে কিনা নীলিমা বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তাকায় অপরেশের মুখের দিকে। রাগ রাগ মুখ। হাতে মোটা নথি। বোধ হয় রাত জেগে দেখবে। শেষ চুমুক দিয়ে নীলিমা কাপটা দূরে সরিয়ে রেখেছে। একটা রসগোল্লা আর দুটো বিস্কুটও

আনিয়ে নিয়েছে চাকরকে দিয়ে। ছবি দেখে ফিরলে বিকেলে বেশ খিধে পায় তার।

কোথায় গিয়েছিলে? উকিলের মতই জেরা করে অপরেশ।

নীলিমা ভয় পায় না। লজ্জা পায়। বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়া নিয়ম ভাঙা নয় অপরেশের মতে। কিন্তু হুপ করে একা বেরিয়ে পড়া আর অন্ধকার হবার পর ফিরে আসা অপরাধ না হলেও তার চোখে বিসদৃশ।

ছোট ননদের নাম করে কুণ্ঠিত হয়ে নীলিমা বলে, খুকির ওখানে গিয়েছিলাম। কিছুতেই ছাড়লো না—জোর করে ছবি দেখতে নিয়ে গেল—

কিন্তু আর কেউ কি ছিল না ওদের বাড়িতে ট্যাক্সি করে তুমি একা একা এই সন্ধ্যেবেলা ফিরে এলে—

বাসে-ট্রামে যা ভিড়! ট্যাক্সি ড্রাইভার বুড়ো—আমি দেখেই ডেকেছিলাম।

লোকে বলবে কি? নীলিমার যে কোন বিপদ হতে পারতো সে-ভাবনার ধার দিয়ে যায় না অপরেশ—অত লোক বসেছিল নিচের ঘরে—তাদের চোখের ওপর বাড়ির বউ একা একা ট্যাক্সিতে অন্ধকারে ঘুরে এল—কতবার বলেছি একটু ভেবে-চিন্তে কাজ করবে—

তোমার বাইরের লোকরা তো আর জানে না আমি কে।

জানুক না জানুক, এভাবে চলাফেরা করবার তোমার দরকারটাই বা কি? আজ খুকির সঙ্গে দেখা না করতে গেলেই কি চলতো না? আমাকে বলতে পারতে—আমি ছুটির দিনে নিয়ে যেতাম-—

মেঝে কাঁপে নীলিমার পায়ের তলায়। ঠোঁটও। কিন্তু চোখটা শুকিয়ে যায়। বুকও। অপরেশের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না। তার সামনে বসে থাকতেও মন চায় না। অস্বাভাবিক কুণ্ঠায় মাথা নিচু হয়ে যায় নীলিমার। সে অপরেশকে কিছুতেই বলতে পারে না যে, এ বাড়িতে আসবার পর প্রত্যেকটি পা সে ভেবে-চিন্তেই ফেলে

হালকা সহজ দেহটাকে নিয়মের বোঝায় যথেষ্ট ভারী আর জড়সড় করে ফেলেছে। রাস্তায় বেরিয়ে তাড়াতাড়ি পা ফেলে সে চলতে পারে না। আকাশের দিকেও চোখ তুলে তাকাতে তার কষ্ট হয় এলোমেলো হাওয়া পর্দা উড়িয়ে ঘরে ছুটে এলে বিরক্তি আসে। পর্দা টেনে টেনে খটখটে দিনের আলো পিষে মারে। আধো-অন্ধকার রান্নাঘরে নুন-মশলা-তেলের গন্ধ আর মাছ-তরকারির ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ তার নাকে সত্যিই এক অনাস্বাদিত ঘ্রাণ নিয়ে আসে। অপরেশের তিল তিল নির্দেশে আজকালকার মেয়ে হয়েও নীলিমা মনে মনে সময়টাকে যেন অনেক পিছিয়ে নিয়ে গেছে। বয়সটাকেও। আর হয়তো শ্রদ্ধাও করেছে অপরেশকে। কারণ, লঘুচঞ্চল নীলিমাকে গাম্ভীর্যের আঁটসাট আবরণে সে অন্য আর এক মানুষ করে তুলেছে। তার কথাই ঠিক, তার নির্দেশই অভ্রান্ত।

কিন্তু নিয়ম-নির্দেশের ওপরে হয়তো এমন কিছু একটা আছে হঠাৎ যার নাগাল পেলে সব-কিছু উল্টে-পাল্টে যায়। নিমের ডালে ছুটো ছোট পাখির পাখা-ঝাপটানি, ঠাণ্ডা হাওয়ার মৃদু একটা ঝলক, কাচের মত পাতলা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, তারপরই চিকন রোদের কম্পমান ছায়া নীলিমার সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন ভুলিয়ে দিতে চায়। তখন তার হাত কেঁপে গেলাস মাটিতে পড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। রান্না-ঘরের ধোঁয়ায় চোখে জল আসে। মাথার ঘোমটা কখন আপনি খসে পড়ে। এঘর থেকে ওঘরে যাবার গতি অনেক দ্রুত হয়।

আজ দুপুরে দোতলার ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে দূরে তালের পাতার সনসন শব্দ অনেকক্ষণ ধরে শুনেছিল নীলিমা। কাঁসার বাসনওয়ালা ঘণ্টা বাজিয়ে গেল। ভিজে ঘাস সামনের মাঠে। হালকা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। এখন হাওয়ায় মাটির সোঁদা গন্ধ। আলমারিতে অপরেশের আইনের বাঁধানো বইগুলি একটু বেশী গুরুগম্ভীর লাগছে নীলিমার চোখে। হাসি পায়। আলমারি, খাট, চেয়ার টেবিল—দেওয়াল। কাঠ আর ইট। কঠিন কঠোর।

পুরু পর্দা বাইরের ভিজে আলো নিষ্ঠুরের মত ঠেকিয়ে রেখেছে। স্রাক স্রাক শব্দ করে সব জানলার পর্দা এক প্রান্তে নীলিমা টেনে দেয়। পাশের বাড়ির সবুজ জানলায় রোদের ফিকে রঙ আয়নার মত কুমারী জীবনকে টেনে আনে। কালো-হলুদ স্লিপারের স্বাধীন আওয়াজ, বিনুনির গিঁট আর ভোরের সাদা নরম শিউলির মত একরাশ তাজা স্বপ্ন। নিয়মের কথা ভুলে যায় নীলিমা। অপরেশের নির্দেশ শিথিল হয়ে যায়। ঠিক তখন ওর নিশ্বাস আস্তে আস্তে যেন বন্ধ হয়ে আসে। দেওয়াল এগিয়ে আসে কাছ থেকে কাছে। সেই মুহূর্তে ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে না। সমবয়সী ছোটননদের বাড়িতেই বেরিয়ে পড়ে। পাতলা রোদ্দুর ছড়ানো নির্জন দুপুর ওকে অনেক দিন পর—বোধ হয় বিয়ের পর প্রথমবার ঘর থেকে টেনে বের করে।

একা-একা রাস্তায় বেরিয়ে নীলিমার গতি কিন্তু অনেক হ্রাস হয়ে যায়। হাঁটতে অস্বস্তি লাগে। কে দেখছে, কারা দেখছে, কি ভাবছে কে জানে! ট্রামে উঠতে গিয়ে হোঁচট খায়। কতদিনের অনভ্যাস। সব অভ্যাসই তার বদলে গেছে। চলার ধরনটাই অন্যরকম হয়ে গেছে একেবারে। ট্রামে বসে ভাল লাগে না। বাড়ি ফিরে গেলেই হয়। খুকির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চমকে-চমকে ওঠে। চাকরটা বাড়ি খালি রেখে আবার বেরিয়ে যাবে না তো!

ছোট ননদ খুকি কথা শোনে না। ছাড়ে না। অবাক হয়। নীলিমাকে দেখে খুশি উপচে পড়ে চোখে-মুখে। একরকম জোর করে ধরে নিয়ে যায় কাছাকাছি প্রেক্ষাগৃহে নামকরা এক বাঙলা ছবি দেখাতে। অপরেশ আসবার আগে নীলিমার বাড়ি ফিরে আসতে না পারার কারণই হল তাই।

বোধ হয় সবেমাত্র অফিস ছুটি হয়েছে। বেশ বড় ছবি। ভাঙতে ভাঙতে প্রায় ছ'টা বাজলো। এখন ট্রামে-বাসে চড়ে নীলিমার পক্ষে বালিগঞ্জের কাঁকুলিয়ায় পৌঁছনো তো অসম্ভব। তবুও তার চেষ্টার শেষ নেই। চোখ টান করে ট্রামের পর ট্রাম দেখে। হাত দেখিয়ে

বাস থামাতে চায়। ট্রামে উঠতে পারে না। আর বাস তো থামেই না। তখন একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ইশারায় ডাকে নীলিমা। বাড়ি ফেরবার তাগিদ, ভয় আর উত্তেজনা। ট্যাক্সিতে বসে বুক কাঁপে। একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে যেন চলেছে—কোথা থেকে কোথায়—নিজেই হঠাৎ বুঝতে পারে না। ক্লান্ত ভারী দেহ। এদিক-ওদিক তাকাতে ভয় লাগে। কষ্ট হয়। অনভ্যাস! তাই অপরেশের সৃষ্টি করা নিয়মটাই এখন তার পক্ষে সহজ আর স্বাভাবিক মনে হয়।

কিন্তু এত কথা অপরেশকে বলবার ভাষা নীলিমা খুঁজে পায় না। চেষ্টাও করে না। চুপ করে থাকে। পাখা চলছে মাথার ওপর। একটু-একটু শীত লাগছে তার। সে উঠে পাখা বন্ধ করে দেয়। অপরেশের সামনা-সামনি ঠিক এই সময় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না। ছুতো করে রান্নাঘরে পালিয়ে যাবে কিনা ভাবে।

আর কখনও এ রকম করো না, খুব বেশী কর্কশ নয় কিন্তু অপরেশের গলার স্বর, আমার মান-সম্ভ্রম তোমার হাতে—বাঁচাও, না বাঁচাও তোমার ইচ্ছে—

আস্তে নীলিমা বলে, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ন্যায়-অন্যায় বোঝবার ক্ষমতাও যে হয়েছে তাই ঢের।

হাওয়া নেই। পাখাও বন্ধ করে দিয়েছে নীলিমা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। গলা শুকিয়ে যায়। বুঝতে পারে না, অপরেশ এখন খাবে কিনা। তার নিজের একটুও ক্ষিধে নেই। অপরেশ আর একটু পরে খেলেই ভাল হয়। আবার সুইচ টেপে নীলিমা। পাখার ব্লেড কেঁপে ওঠে। অস্ফুট গুঞ্জন। তারপরই হাওয়া এসে গায়ে লাগে। ঠাণ্ডা-গরম।

টেবিল-ল্যাম্পটা নিজেই জ্বালিয়ে নেয় অপরেশ। দু-একটা বই টেনে বের করে আলমারি থেকে। বাঁ হাতের কনুই টেবিলের ওপর রেখে আঙুল চেপে ধরে। নীলিমাও নিশ্চিন্ত হয়। এখন আর একেবারেই কথা বলবে না। যত রাতই হোক, খাওয়ার কথা মনে

করিয়ে দিলেই বিরক্ত হবে। যখন ইচ্ছে হবে, তখন নিজেই খেতে চাইবে অপরেশ। সে-ঘর থেকে পা টিপে টিপে নীলিমা হঠাৎ এক সময় চলে যায় অন্য ঘরে।

সেই প্রথমবার বাইরের ঘর থেকে নীলিমার ডাক আসে। চাকর এসে বলে, অপরেশ তাকে বাইরের ঘরে যেতে বলেছে এখুনি। তার কথা সে কানে তোলে না। চাকরটা বোকা। অনেক সময় অনেক কথা নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে বলে। ধোপার হিসেব লিখতে লিখতে নীলিমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, নিজের কাজ কর।

বাইরের ঘর থেকে তার ডাক যে কোন দিনও আসবে না, সে-বিষয়ে নীলিমা নিঃসন্দেহ। এটাও এ বাড়ির একটা নিয়ম বোধ হয়। সদর আর অন্দর। নীলিমা অন্দরের মানুষ। তার সদরে যাওয়া বারণ। নানা জাতের মক্কেলের সামনে সেখানে হঠাৎ গিয়ে পড়লে মান যায় অপরেশের।

এক দিনের কথা মনে পড়ে যায় নীলিমার। চাকরটা কোথায় গিয়েছিল। বাইরের ঘর থেকে তার নাম ধরে ডেকে কয়েক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে বলে অপরেশ। বোধ হয় মক্কেলদের তাড়া ছিল। একটু পরে আবার অপরেশ চেঁচিয়ে বলে তাড়াতাড়ি চা নিয়ে যেতে।

তখন নীলিমা নিজেই চা করে নেয়। চাকরের আশায় বসে না থেকে ট্রে হাতে নিজেই চলে যায় বাইরের ঘরে। জোরালো আলোচনা করছিল তখন অপরেশ। হঠাৎ থেমে যায়। চমকে ওঠে। দৃষ্টি কঠিন হয়ে ওঠে তার। উঠে দাঁড়িয়ে চায়ের ট্রে নীলিমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে, তুমি যাও।

নীলিমা ভেতরে চলে আসে। অপরেশও আসে তার পেছন পেছন। চায়ের ট্রে বাইরের ঘরে গোল টেবিলটার ওপর পড়ে থাকে যেমনকার তেমন। রান্নাঘরের চৌকাঠের এদিকে দাঁড়িয়ে নীলিমাকে উদ্দেশ করে চাপা কর্কশস্বরে বলে অপরেশ, একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার—নিজে অতগুলো বাইরের লোকের সামনে কেন গেলে চা নিয়ে?

রাম নেই। তুমি বার বার চায়ের কথা বলছ। কি করব?

তা বলে তুমি নিজে যাবে বাইরের ঘরে? একটু পরে আমি নিজে ভেতরে আসতাম—তখন আমাকে বলতে পারতে—না-হয় ভেতর থেকে আমাকে বলতে যে, রাম নেই। ছিঃ ছিঃ, কি যে কর হঠাৎ—তোমার কি মাথার ঠিক নেই?

নিলীমার মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যায়, না।

আর এমন কাজ করো না—আর কখনও বাইরের ঘরে যাবে না তুমি, একটু থামে অপরেশ। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, কোনটা শোভন আর কোনটা অশোভন, নিজের বুদ্ধিতে এত দিনে তাও বুঝতে পার না? আশ্চর্য! বাইরের ঘরের পুরু পর্দা সে ভাল করে টেনে দেয়। চটি ফটফট করতে করতে আবার চলে যায় সে-ঘরে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে নীলিমার দিকে তাকিয়ে যায় একবার। নীলিমা দাঁড়িয়ে থাকে সেখানেই। ডালপালা-কাটা একটা ন্যাড়া গাছের মত। নড়ে না। সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের শিকড়টাই বোধ হয় উপড়ে ফেলতে চায়।

আজও সেদিনের মত অপরেশ এসে দাঁড়ায় নীলিমার পাশে। ধোপার খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় নীলিমা। সাধারণত এ সময় ভেতরে আসে না অপরেশ। আবার কি অন্যায় হল কে জানে। মনে মনে নীলিমা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অপরাধীর মত মুখ করে তাকিয়ে থাকে স্বামীর দিকে।

কিন্তু আজ অপরেশের চেহারাটা একেবারেই অন্যরকম দেখায়। একটুও বিরক্তি নেই চোখে। হাসি-হাসি মুখ। নীলিমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চুলটা আলগোছে ঠিক করে নেয় সে। হাত দিয়ে পাঞ্জাবির ওপর উড়ে-পড়া সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে।

বাঃ! অপরেশ বলে, এখনও বসে আছ—একবার বাইরের ঘরে যেতে হবে যে। শাড়িটা বদলে নাও।

আশ্চর্য অপরেশের গলার স্বর। বিয়ের পর থেকে এই মুহূর্তের

আগে অবধি কখনও দরদের এমন অপূর্ব রেশ কাঁপে নি তার গলায়। কথা বলতে পারে না নীলিমা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অপরেশের দিকে। বোবা একটা মেয়ের মত।

আমি বাইরের ঘরে যাব?

হ্যাঁ, অপরেশ হাসে, রাম বলে নি তোমায়? কখন খবর পাঠিয়েছি আমি—

হ্যাঁ বলেছিল, থেমে থেমে কথা বলে নীলিমা, কিন্তু ও ঘরে আমি—

হ্যাঁ যাবে। তাড়াতাড়ি কর, নীলিমার পিঠে একটা হাত রাখে অপরেশ, মিসেস সেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

তিনি কে?

আমার প্রথম মেয়ে-মক্কেল। দেখবে চল না, অপরেশ মৃদু মৃদু হাসে, মাথা ঘুরে যাবে।

খুব সুন্দরী বুঝি?

অপরূপ!

ভেতরে নিয়ে এলেই তো পারতে

না না, শঙ্কিত হয়ে ওঠে অপরেশ, কি রকম এলোমেলো হয়ে আছে ঘরটা—আর তুমিও কি অবস্থায় আছ—কথা শেষ না করে অপরেশ বলে, আর দেরি করো না, তৈরি হয়ে নাও লক্ষ্মীটি—সিঁড়ি দিয়ে সে নিচে নেমে যায়। আর নীলিমা ক্লান্ত হাতে আলমারি টানে।

সাদা সাধারণ একটা শাড়ি। মুখে অল্প অল্প পাউডার। চুলটা ঠিক করে বাইরের ঘরের পর্দার পাশে নীলিমা এসে দাঁড়ায়। অপরেশকে জানাবার জন্যে আড়াল থেকে একটু জোরে চটির শব্দ করে। ইচ্ছে করে একবার কাশে।

উঠে দাঁড়িয়ে অপরেশ বলে, এস—এই যে মিসেস সেন—আর ইনি মিসেস নিয়োগী—

কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে নীলিমা ঘামে। প্রথমে বুঝতে পারে না যে মিসেস নিয়োগী তারই নিজের নাম। নমস্কার করে মিসেস সেনকে। বয়স বোধ হয় তারই সমান। তার চেহারায় অপূর্ব রূপের সন্ধান নীলিমা পায় না। তবে প্রসাধনের জলুস চোখে পড়ে। মুখে শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল করার প্রগাঢ় চেষ্টার ছাপ। তুলির টানে ঠোঁট নিষ্প্রভ রক্তিম। ব্লাউজের হাতা ছোট। কানে আর হাতে হীরের গয়না। মানায় নি। টেবিলের ওপর রাখা বেশ বড় একটা সবুজ ব্যাগ। মিসেস সেনের শাড়িটাও সেই রঙের।

গলার আওয়াজটা মিষ্টি মিসেস সেনের। কিন্তু স্পষ্ট আর জোরালো। আস্তে বললেও প্রত্যেকটি কথা কানে যায়। হঠাৎ কোন কথা বলতে পারে না নীলিমা। ভীত, ত্রস্ত। বাইরের ঘরে বসে থাকার লজ্জায় জড়সড়। তাকায় এপাশে-ওপাশে। ঘরটাকে চিনতে পারে না। কথা বলতে কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আটকে আসে। পাশের চেয়ারে আর একটি লোক। আধ-বোজা চোখে বসে বসে পান চিবোচ্ছে। আর কোনও মক্কেল বোধ হয়। তার সঙ্গে অপরেশ একটাও কথা বলে না। টাকা বাকি আছে নিশ্চয়ই। যে মক্কেলরা পয়সা দেয় না, তাদের দেখেও দেখে না অপরেশ। বসিয়ে রাখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। প্রৌঢ় ভদ্রলোক হয়তো তেমন কোন একজন। মাথার সরে যাওয়া ঘোমটা সতর্ক হাতে ভাল করে টানে নীলিমা।

বসুন, মিসেস সেন হাসে, আপনা স্বামীকে প্রায়ই বিরক্ত করতে আসব—

হাত কচলে অপরেশও হাসে, হেঁ হেঁ হেঁ—

তাই আপনার সঙ্গেও আলাপ করে গেলাম। কাজের অনেক ক্ষতিও করলাম হয়তো—

না না, মাথা নামিয়েই কথা বলে নীলিমা।

মিস্টার নিয়োগা, মিসেস সেন বলে, ইওর ওয়াইফ ইজ ভেরি সুইট। আপনার নামটা বলুন না মিসেস নিয়োগী?

খুব আস্তে নীলিমা ফিসফিস করে বলে, নীলিমা।

বোধ হয় মিসেস সেন তার কথা শুনতে পায় না, পার্ডন ?

নীলিমা, বেশ জোরে বলে অপরেশ, সি ইজ ভেরি শাই অ্যাণ্ড ওয়েল।

হ্যাটস হোয়াই সি ইজ সো চার্মিং, নীলিমার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে মিসেস সেন বলে, আমার নাম রুবি। মনে থাকবে

হ্যাঁ।

নতুন একটা সিগারেট ধরায় অপরেশ, লাইক টু হ্যাভ এ কাপ অফ টি মিসেস সেন ?

নো থ্যাঙ্কস, এখন তো প্রায়ই দেখা হবে। তখন একদিন ইওর সুইট নীলিমা উইল অফার মি এ কাপ অফ নাইস টি—কি বলেন ?

হ্যাঁ।

নীলিমার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা হঠাৎ কঠিন হয়ে ওঠে অপরেশের। কিন্তু তা বোধ হয় মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। আর শুধু নীলিমাই ওর চোখ দুটো দেখে চমকে ওঠে। বিচলিত হয়। কি নিয়ম ভেঙেছে —কি ভুল করেছে, হঠাৎ বুঝতে পারে না। পুতুলের মত তাকায় একবার অপরেশের দিকে আর একবার মিসেস সেনের দিকে। কি একটা কথা বলে জোরে হেসে ওঠে রুবি। অপরেশও।

ওদের কথা শোনে নি নীলিমা। কিন্তু রুবিকে বড় চেনা-চেনা মনে হয়। ওর কথা বলবার ধরন, সহজ ভঙ্গি আর অসঙ্কোচ গতিবিধি—তার কুমারী জীবনের কথাই যেন নতুন করে মনে পড়িয়ে দেয়। বুঝতে পারে নীলিমা। ধরতে পারে। খুঁজেও হয় তো পায়। কিন্তু চিনতে পারে না। নিজের কাছে নিজেকে পেয়েও পায় না। এ ঘর থেকে এখুনি সে চলে যেতে চায় রান্নাঘরে। অনেক কাজ বাকি। চাকরটা কি করছে কে জানে! ওর ওপর আজও নীলিমা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারে না। যদিও আজ ছুটির দিন। অপরেশের কোর্টে বেরুবার তাড়া নেই।

গেটের কাছে একটা ভিখিরী এক সুরে ভিক্ষে চাইছে। বিরক্তিকর সুর। অপরেশ হাত নেড়ে তাকে থামতে বলে। সে থামে না। পুরনো কাগজওয়ালা ডেকে যাচ্ছে রাস্তায়। একটা নতুন মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। রুবির গাড়ি নিশ্চয়ই। পাশের চেয়ারে লোকটি তখনও ঢুলছে।

হরিহরবাবু, অপরেশ বলে, আপনি কাল আসবেন।

চমকে ভাল করে উঠে বসে হরিহরবাবু, আজ্ঞে কি বললেন?

আজ এঁর মামলা নিয়ে একটু ব্যস্ত। আপনি কাল আসবেন—

যে আজ্ঞে।

না না, আপনি কাজ করুন মিস্টার নিয়োগী। আমার কথা মোটা-মুটি তো শুনেছেন। আমি আবার পরশু দিন সন্ধ্যেবেলা আসব, রুবি উঠে দাঁড়ায়। হাল্কা হাতে ব্যাগটা তুলে নেয় টেবিলের ওপর থেকে। নীলিমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসে। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় গেটের দিকে। অপরেশও হাসিমুখে যায় তার পেছন পেছন—একেবারে মোটর গাড়ি অবধি। আর কোন দিকে না তাকিয়ে নীলিমা সেই অবসরে সোজা চলে যায় রান্নাঘরে।

একটু পরে অপরেশ এসে দাঁড়ায় চৌকাঠের এপারে সেই এক ভঙ্গিতে। তার এই চেহারাটা খুব চেনা নীলিমার। কোন ত্রুটি হলে, এ বাড়ির কঠিন নিয়মের একটু এদিক-ওদিক হলে অপরেশ কড়া উকিলের মতই ঠিক এমনি করেই তাকে নির্দেশ দেয়। নীলিমা রান্না ফেলে ভয়ে-ভয়ে স্বামীর সামনা-সামনি দাঁড়ায়।

কথা বলতে পার না? তিক্ত বিরস মুখ অপরেশের, একজন এল বাড়িতে, তাকে ভাল করে চা খাওয়ার কথাটাও বলতে পারলে না?

তুমি তো বললে—

আমি কি বাড়ির গিন্নী? লোকের সামনে তোমাকে বের করা-ও দেখছি লজ্জার ব্যাপার— শুধু ঘোমটা টেনে সঙ সেজে বসে থাকতে জান। ছি ছি, গেট অবধি এগিয়ে দিতেও গেলে না—

তুমি তো বল নি?

এ-সবও কি বলে দিতে হয়? বড়লোকের স্ত্রী। আমার কাছে এসেছে পরামর্শ নিতে। অন্তত আমার দিকে চেয়েও তো তাকে একটু খাতির-যত্ন করতে হয়।

আবার এলে তুমি বলে দিয়ো কি করব।

এ-সব জ্ঞান তোমার নিজের নেই? লোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখছি আজকাল তোমার কষ্ট হয়, জোরে জোরে সিগারেট টানে অপরেশ। রুবিকে দেখলে তো—কি ভীষণ কাজের! কথাবার্তা ব্যবহারের ধরনটাই আলাদা। স্বামী এখানে নেই। ভাড়াটেদের মামলা করে একাই শায়েস্তা করে দেবে। তুমিও তো লেখাপড়া শিখেছিলে, নীলিমার আপাদমস্তক বিরক্তির দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সে বলে, রান্নাঘরে বসে শুধু খুন্তি নাড়তেই জান!

খুন্তিটা এখন হাতে নেই নীলিমার। একটু আগে ছিল। হয়তো অপরেশ দেখেছে। মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে যায় তার। অপরেশের চেহারাটা ঠিক আছে বটে কিন্তু ভাষার মধ্যে সে ছন্দ খুঁজে পায় না। সে যেন অন্যরকম কথা বলে। মানে বুঝতে পারে না নীলিমা। যদি সে নিয়ম মেনে থাকে তাহলে অপরেশের গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠবে কেন? আর এ সংসারে সে নিজেই যে নিয়মের সৃষ্টি করেছে, নীলিমা তার বিরুদ্ধে কাজ করবে কেমন করে? সে কথাটা সে নিজেই এখন কিছুতে বুঝতে পারে না। অপরেশ চলে গেছে আবার বাইরের ঘরে। হরিহরবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ হয়তো আলোচনা করবে। তারপর হয় পড়বে, নয় চা খেতে চাইবে। কিম্বা কোন বন্ধুর বাড়ি ঘুরে আসবে ঘন্টাখানেকের জন্যে। ছুটির দিনে দুপুরে খেতে অনেক দেরি হয়।

এত দিন শুধু অপরেশের চেহারাটাই দেখে এসেছিল নীলিমা কিন্তু হঠাৎ একদিন ওই রুবি সেনকে উপলক্ষ্য করেই অপরেশও দেখলো নীলিমার এক আশ্চর্য চেহারা। সে জুড়িয়ে গেল। থেমে গেল।

নীলিমা তার কঠিন নিয়মের নিজস্ব স্বাধীন চেহারা দেখিয়ে একেবারে নিবিয়ে দিল অপরেশকে।

আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে রুবি সেনের কাজের খাতিরে। নীলিমা কখনও থাকে, কখনও থাকে না। গল্প শোনে। মাঝে মাঝে কথা বলে। অপরেশের নির্দেশ মানতে পারে না এক্ষেত্রে। আগেকার নিয়ম ইচ্ছে করেই মেনে চলে। যা খুশি বলুক তাকে অপরেশ—সঙ কিম্বা অন্য কিছু। রুবি সেনের মত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করা এখন নীলিমার পক্ষে অসম্ভব।

কলকাতায় তুটো বড় বড় বাড়ি আছে রুবি সেনের। স্বামী মস্ত বড় ব্যবসায়ী। সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে গেছে ব্যবসার খাতিরে। মাস কয়েকের মধ্যে কাজ মিটিয়ে ফিরে আসবে। রুবিও সঙ্গে যেত কিন্তু ভাড়াটেদের সঙ্গে গোলমাল চলছে। এ সময় তুজনে উধাও হয়ে গেলে তাদেরই সুবিধা হয় বেশি। তাই চন্দন সেন স্ত্রীর ওপর সব ভার চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ সারতে গেছে।

দেখ তো কেমন স্ত্রী, অপরেশ যেন নীলিমার দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়, স্বামীকে সাহায্য করছে সব কাজে। ব্যাঙ্কে আপিসে একা-একা যাওয়া-আসা করে—

তাই নাকি ?

বাঃ, নিজের চোখে দেখতে পাও না ?

হ্যাঁ দেখি তো, নীলিমা অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে অপরেশকেও একবার দেখে নেয়। তার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না।

এমন স্ত্রী থাকলে কত সুবিধা হয় স্বামীদের—সংসার চালাবার অর্ধেক ভাবনা কমে যায়—

নীলিমা বলে ফেলে, আর অমন স্ত্রী যাদের সেই স্বামীরাও বোধ হয় প্রথম বিয়ের পর থেকেই একটু অন্য রকম—

মানে ?

মানে এসব কাজ করতে পারার শিক্ষাটাও দেওয়া চাই তো ?

এই ধর একা একা বেরিয়ে পড়া—এখানে-ওখানে যাওয়া—স্বামীর অনেক কাজের দায়িত্ব সহানুভূতির সঙ্গে মাথায় তুলেও তো দিতে হয়—মানে প্রথম থেকেই একেবারে অন্য রকম নিয়মের সৃষ্টি করা—স্বামীই তো করে—

ও, অপরেশ ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলে, তুমি অমন হতে পার ?

তুমি বিলেতে ব্যবসা করতে গেলে—অমন করে গড়ে তুলতে পারলে হতে পারতাম বইকি। আজ রুবি সেন কি আমার মত হতে পারে ?

সেদিন আর কোন কথা বলে না অপরেশ। আস্তে আস্তে নীলিমার সামনে থেকে সরে যায়। মনে মনে ভাবে, মেয়েদের তর্ক করার ইচ্ছেটা বোধহয় চিরকালই প্রবল।

ওদিকে রুবি সেন একদিন ওদের দুজনকে নেমন্তন্ন করে। আরও দু-পাঁচজন আসবে। কোন বিশেষ কারণ নেই, একা থাকে বলে মাঝে মাঝে সে বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে ডাকে। অপরেশ যেন নীলিমাকে নিয়ে নিশ্চয়ই যায় আজ সন্ধ্যাবেলা।

যাবার আগে-আগে অপরেশ যথারীতি নির্দেশ দেয় নীলিমাকে। একটু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বলে। আরও অনেকে আসবে। রুবির চেনা-শোনা বহু লোককে এবার তার মক্কেল হিসেবে পাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই নীলিমা যেন মুখ বুজে ঘাড় কাত করে এক দিকে চুপ করে বসে না থাকে। একটু চালাক-চতুরের মত ব্যবহার যেন করে সকলের সঙ্গে।

আর দেখ, নীলিমার দিকে তাকিয়ে যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে অপরেশ। মাথায় অত বেশী সিঁদুর দিয়ো না, ওদের সামনে বোকা বোকা দেখায়। ঘোমটাটা আজ না হয় নাই বা দিলে, রুবিকে তো একদিনও ঘোমটা দিতে দেখি নি। সব সময় শাঁখাজোড়াটা পরে থাকারই বা কি দরকার। আজকাল ওসব একেবারেই চলে না। আজ শাঁখাজোড়াটা খুলেই রেখ না হয়—

সাপের ফণার মত হঠাৎ মাথা তোলে নীলিমা। অপরেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিদ্বেষ ফুটে ওঠে তার দৃষ্টিতে। কি বলতে চায়—ঠোঁট দুটো শুধু কাঁপে। কথা বলতে পারে না।

একটু পরে তীক্ষ্ণ স্বরে নীলিমা বলে ওঠে, না, না, না, আমি তোমার কোন কথা শুনতে পারবো না। আমি যেমন ভাবে সব জায়গায় যাই, আজও ঠিক তেমনি ভাবেই যাব। সাজ-পোশাকের একচুল এদিক-ওদিক করতে পারবো না। ইচ্ছে হলে তোমার রুবি সেনের বাড়িতে নিয়ে যেয়ো, না হলে নিয়ে যেয়ো না—

বিস্মিত বিমূঢ় অপরেশ। ভেবে পায় না তার শান্ত স্ত্রী এমন মুখরা হয়ে উঠল কেন! সে তবুও আগের মত কঠিন হয়ে ওঠে। গম্ভীর স্বরে আর একবার বলে, ওদের মত মক্কেল পেলে আমার কত সুবিধা হয়—সুযোগ পেয়েও আমাকে সাহায্য করতে চাও না—কেমন স্ত্রী তুমি নীলিমা!

ঝাঁজের সঙ্গে নীলিমা বলে, না, না, না। তোমাকে কোন রকম সাহায্য আমি করতে চাই না—করতে পারবো না—

রাগে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে অপরেশ। নীলিমাকে আর কিছু বলবার ভাষা হঠাৎ খুঁজে পায় না। আর নীলিমা মুখ নামিয়ে নেয়। স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে সঙ্কোচ হয়। যোগ্য সহধর্মিণী হবার জন্যে তার সৃষ্টি করা সব নিয়ম বিনা প্রতিবাদে এত দিন সে ধর্মের মতই গ্রহণ করেছে—মাঝে মাঝে অসহ্য কষ্ট হলেও তিল তিল করে মেনে এসেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ নীলিমা আবিষ্কার করে কোন ধর্মই নেই অপরেশের। তাই সে মুখ নামায়। লজ্জায় নয়—তিক্ত অশ্রদ্ধায়। আর কোন দিন অপরেশের কথায় নীলিমা নিজের ধর্মকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারবে না।

বিকেল গড়িয়ে যায়। পাণ্ডুর আলো কাঁপে। অপরেশ কিন্তু এখনও বুঝতে পারে না রুবি সেনের ওখানে নীলিমা যাবে কিনা।

১লা অক্টোবর : ১৯৫৮
বুধবার : কলিকাতা

॥ ভিত ॥

প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সিমেণ্ট শুকিয়ে যাবার পর ঘরের মেঝে ঘষে ঘষে ঝকঝকে করে দিয়েছে জগু আর সুবাসী। এখন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীরা মই নিয়ে ঠুকঠুক করে শব্দ করে সারাদিন। আলো আর পাখা ঠিক করে। কাল ত্নটো বড় বড় গেট ফেলে রেখে গেছে এঞ্জিনীয়ার সাহেব। আজ লোক আসবে। গেট ত্নটো বসানো হবে বোধ হয় সকাল থেকেই।

গেটের কাছ থেকে সিঁড়ি অবধি পাকা রাস্তা হবে। সেটুকু হয়ে গেলেই কাজ শেষ। তখন আবার ঠিকাদার যেখানে ঠেলে দেবে সেখানে যেতে হবে জগুকে। সুবাসী যাবে কিনা কোন ঠিক নেই।

ঠিকাদার কাকে কখন কোথায় পাঠায় বলা যায় না। তার হাতে এখন অনেক কাজ।

জল দিয়ে কড়াইয়ে সিমেণ্ট গুলতে গুলতে সুবাসী জিজ্ঞেস করে, আর কদিন এর কাজ রে জগু?

হপ্তাখানেক তো বটেই। এই রাস্তাটা বানানো হয়ে গেলেই কাজ খতম, আধপোড়া বিড়িটা কানে গুঁজে জগু বলে, তোকে কিছু বলে নাই ঠিকাদার?

বলবে আবার কি? ঠিক মত কাজ করলে বলাবলির অবসর পায় নাকি মানুষ?

কর্নিক দিয়ে ইঁটের ওপর সিমেণ্ট মাখাতে থাকে জগু। মাথা তুলে হাসে। সুবাসী তার কথার অর্থ বুঝতে পারে না। তাকে আবার বলবে কি ঠিকাদার? হাতুড়ির বাড়ি মেরে গাড়ি গাড়ি ইঁট ভাঙতে পারে সে। হাত চালিয়ে মশলা বানায় কড়াই কড়াই।

সন্ধ্যে অবধি সমানে খাটে। বেহারী মেয়েদের হার মানিয়ে দেয় সুবাসী। এখন কথা হল, জগু জানতে চায়, এরপর যেখানে কাজ হবে, অর্থাৎ পদ্মপুকুরের পাশে সেই পড়ো বাড়িটায়, সেখানে জগুর সঙ্গে সুবাসীকেও আবার কাজে বহাল করবে কিনা ঠিকাদার।

বসে বসেই কোমরের গামছাটা আরও শক্ত করে বাঁধে জগু। ফিকফিক করে হেসে বলে, না রে না, সেকথা বলি নাই আমি। কাজের তোর খুঁত ধরবে কে রে?

চোখ ঘুরিয়ে সুবাসীও হাসে, তবে?

বলছিলাম কী, জগু তাকিয়ে নেয় এদিক-ওদিক, এখানকার কাজ চুকলে যাবি কোথায়?

তুই যাবি কোথায়?

হুই পদ্মপুকুর।

হাতে খালি কড়াইটা নাচিয়ে হালকা সুরে সুবাসী বলে, আমি যাব—হুই মনোহরপুকুর। হাত চালা রে জগু, কাজে তোর মন নাই রে দেখি। বলি, খালি কথা কয়েই মজুরি নিবি?

তুই দিলি কই মজুরি?

দূর—সুবাসী চলে যায় একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সিমেন্ট গোলা দিয়ে আবার কড়াই ভর্তি করতে। যেতে যেতে ইচ্ছে করেই একবার পিছন ফিরে তাকায়। জগুর কথার মানে যেন এতক্ষণ পর আরও ভাল করে বুঝতে পারে। আর ঠিক তখন খুব জোরে দুবার মোটর গাড়ির হর্ন বাজে।

এঞ্জিনীয়ার সাহেব এসে গেছে। আসবেই। রোজ না হোক, সপ্তাহে চার পাঁচদিন বাড়ি তদারক করতে আসে সাহেব। এদিক-ওদিক তাকায়। দেওয়াল পরখ করে। কোন কোন দিন ঠিকাদারকে জোরে জোরে তাড়া দেয়। তারপর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে মেমসাহেবের সঙ্গে কাজ দেখতে দেখতে গল্প করে অনেকক্ষণ। একটার পর একটা সিগারেট খায়। গাড়ি থেকে চায়ের ফ্লাস্ক আর

কাপ এনে দেয় জগু। এঞ্জিনীয়ার সাহেব তখন চা খেতে খেতে মেমসাহেবের সঙ্গে গল্প করে। হা-হা করে হাসে।

হাসি শুনে সিমেণ্টের কড়াই মাটিতে শব্দ করে ফেলে সুবাসী মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে। সাহেবের পিঠে হাত রেখে মেমসাহেবও তখন হাসছে। হাসাহাসিটা ভালই লাগে সুবাসীর। বড় ভাব ওদের দুজনের। কোন কাজ না থাকলেও কড়াই মাথায় নিয়ে আড়-চোখে সাহেবের আর মেমসাহেবের দিকে তাকাতে তাকাতে বারান্দার কাছ দিয়ে সে একবার ঘুরে যায়। কড়া আতরের গন্ধ, সিগারেটের নীল ধোঁয়া, সাহেবের ভারী গলার স্বর আর মেমসাহেবের মিষ্টি মুখ—সুবাসী বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, জগুর কাছে এসে ফিসফিস করে কথা বলে।

সাহেবের বউ, না রে ?

কোন্ সাহেবের ?

ওই যে—

দূর। আসল সাহেবের বউ ওই মেমসাহেব। সেই সাহেবেরই তো বাড়ি। মেমসাহেব নিজে পছন্দসই ঘর বানাবে বলে শলা-পরামর্শ দেয় এঞ্জিনীয়ার সাহেবকে।

কথাটা সহজে বিশ্বাস করতে পারে না সুবাসী। জগুর অনেক কথাই সে বিশ্বাস করে না। তাই হাসে কথা শুনে। ওদিকে মেমসাহেব তখন উঠে দাঁড়িয়েছে সাহেবের সঙ্গে। বেতের টেবিলের ওপর চায়ের খালি কাপ আর ফ্লাস্ক পড়ে আছে। আর বোধ হয় সেদিনকার খবরের কাগজ। রাস্তার পাশের ঘরে এসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায় মেমসাহেব। আস্তে আস্তে কি বলে সাহেবকে। সুবাসী শুনতে পায় না

সে কিন্তু এবার বেশ জোরে জোরেই কথা বলে জগুর সঙ্গে, যার বাড়ি, সে সাহেব কই ?

এসেছে বটে দু-চারবার। সাহেব কাজের মানুষ। সময় নাই মোটে। একেবারে বসবাস করতেই আসবে—দেখিস তখন।

জগুর কথাটা বোধ হয় সুবাসী শুনতে পায় না। ঘুরে ঘুরে মেমসাহেবকে দেখে। এঞ্জিনীয়ার সাহেবকেও। জানলার শিক পরখ করছে সাহেব। মাঝে মাঝে হাতও টানছে মেমসাহেবের। মেমসাহেব হাসছে। দেখছে সুবাসীকে। কিন্তু দেখেও দেখছে না তাকে। একটা চিরুনি দিয়ে সাহেবের চুল ঠিক করে দিচ্ছে।

ফেকন—ঠিকাদারের নাম ধরে এঞ্জিনীয়ার সাহেব একটু জোরেই ডাকে।

ফেকন ছুটে এসে বলে, হুজুর।

মশলা তৈরির ঘেরা জায়গাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে এঞ্জিনীয়ার বলে, আজকেই ওসব সরিয়ে ফেলবে ওখান থেকে। গ্যারাজ বানাতে হবে। বাকি ইঁট আসবে কবে?

ফেকন মাথা চুলকে বলে, আজই এসে পড়বে হুজুর।

ঠিক হ্যায়, যেমন বলে দিয়েছি তেমন করে ইঁট সাজাও। আমরা এখন যাচ্ছি। বিকেলের দিকে আর একবার আসবো, সিগারেটে শেষ টান মারে এঞ্জিনীয়ার, পাম্পটা আজকেই বসিয়ে দিতে হবে—

ফেকন শুধু বলে, হুজুর।

জুতোর মশমশ শব্দ করতে করতে এঞ্জিনীয়ার নামে। মেমসাহেব আসে পাশে-পাশে। চারপাশে তাকায়। হাসে। জগুর কর্নিকে তখন ভিজে সিমেন্ট। সাবধানে পাশ কাটিয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে চলে ওরা। জগু কর্নিক রেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে। আবার মোটরের শব্দ হয়। হর্ন বাজে। বড় রাস্তা ধরে গাড়িটা সোজা বেরিয়ে যায়।

কি জাত রে? তখনও রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে সুবাসী।

মুখ দেখে বুঝিস না? এ দেশের লোকই তো।

যাঃ, আঁচলের গিঁট খুলে একটা পান মুখে দিয়ে সুবাসী বলে, বিলাতী মেমসাহেব।

আর তখন ঠিকাদার ফেকন এসে গজগজ করে, এত টাইম লাগে

কেন রে? সিমেণ্ট ঢালতে বেলা কাবার করলি—এ সুবাসী, এমন করলে কাম নেহি চলবে—

কথা বলে না সুবাসী। শব্দ করে পান চিবোয়। কড়াই মাথায় নিয়ে জগুর কাছে গটগট করে যায় আর আসে। হাতুড়ি দিয়ে ইঁট ভাঙে খট-খট। যা ইঁট আছে তাই দিয়ে গ্যারাজের কাজ শুরু করবে ফেকন। ওগুলো ভাঙতে কতক্ষণ আর সময় লাগবে সুবাসীর? বড় জোর দু ঘণ্টা।

বেলা বারোটা নাগাদ খেতে যায় ফেকন। এ পাড়ায় কাছাকাছি তার বাড়ি।। আর অন্য বেহারী মিস্ত্রীরা মশলা বানাবার ঘরের পাশে টিনের থালায় ছাতুর তাল নিয়ে বসে। জল এখনও আসে নি এ বাড়িতে। ওরা রাস্তার ওপারে টিউবওয়েল থেকে ছোট বালতি করে জল এনে মুখ ধোয়।

পান্তা আর কাঁচা লঙ্কা আনে সুবাসী। একটু দূরে ছায়ায় বসে। জগু ঠিক তার পাশেই সুযোগ বুঝে জায়গা করে নেয়। তেলেভাজা কিনে আনে শালপাতায়। দুটো ফেলে দেয় সুবাসীর পাতে। আর একটা দিতে গেলেই থালা উঠিয়ে চোখ রাঙায় সুবাসী।

ঢকঢক করে কলাই করা গেলাসে চা খায় জগু। ছোট একটা ভাঁড়ে সুবাসীকেও একটু দেয়। সে আপত্তি করে না। জগুর জন্যে পান্তা খেয়ে চা খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে তার। রোদ্দুর আসে। মাছি ওড়ে নাকের ওপর। আর একটু সরে বসে জগু। ওদের নিজের হাতে তৈরি করা নতুন বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে। দোতলা সাদা বাড়ি। ওপরে দুটো ঘর আর নীচে তিনটে। ওপরের একটা শোবার ঘর। আর একটাতে সাহেবের বই থাকবে—পড়বার ঘর। চার পাঁচ হাজার বই নাকি আছে সাহেবের। নীচে বসবার ঘর, খাবার ঘর আর বন্ধু-বান্ধব এলে থাকবার ঘর। কালো নকশা কাটা ঝকঝকে মেঝে। চলতে গিয়ে পা পিছলে যায় সুবাসীর। মেমসাহেবের মত জানলায় দাঁড়িয়ে সে উদাস চোখে আকাশের দিকে

তাকিয়ে থাকে। ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর। আকাশে চিল ওড়ে। পাঁচিলের ওপারে ফাঁকা বড় জমিতে ছুটো গরু সমানে ঘাস খায়। রাস্তা কাঁপিয়ে লোক বোঝাই বাস যায়। সাইকেল রিক্শার ঘণ্টা বাজে ক্রিং ক্রিং। হিমের মত ঠাণ্ডা নতুন ঘরের দেওয়াল। ঠেস দিয়ে বড় আরাম পায় সুবাসী।

জগু হাত ধরে টানে ওর, করিস কি? ছ্যালে দাগ লাগিয়ে দিলি! ইস্—সুবাসীকে সরিয়ে দিয়ে জগু গামছা দিয়ে দেওয়াল ঘষে, ঠিকাদার কাম খতম করে দেবে তোর—

ঠোঁট উল্টে সুবাসী বলে, হুঁঃ।

বাইরে কড়কড়ে রোদ হলেও ঘরটা খুব ঠাণ্ডা। হাওয়া আসছে হু হু করে। তিনটে বড় বড় জানলা বানানো হয়েছে এ ঘরের। সুবাসী চোখ ঘুরিয়ে ভাল করে দেখে সারা ঘরখানাকে। মাথার ওপর ফুটো করে একটা বড় লোহার ডাণ্ডা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাত তুলে লাফালেই সুবাসী ছুঁতে পারে সেটা।

এটা কী রে জগু?

পাখা। হোথায় পাখা টাঙাবে ইলেকটিরিক মিস্ত্রী—

পাখা কি হবে? এ জানলার শিক ছেড়ে ও জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় সুবাসী, হাওয়ার কিছু কমতি আছে নাকি ঘরে?

নাই? এ ঘরে শোবে সাহেব—মেমসাহেব। বাইরের হাওয়া কমতি হলে হাঁস ফাঁস করতে হবে না রাত-বেরাতে? তোর আমার মত গরীব নাকি রে ওরা?

কেন, বাতাস নাই তোর ঘরে?

নাই? উড়িয়ে নিয়ে যায় মানুষকে—

রসিকতার সুরে সুবাসী বলে, বটে?

হঠাৎ গলার স্বরটা অন্যরকম শোনায় জগুর। চোরা চাউনি দেয় এদিক-ওদিক। সুবাসীর আরও কাছে সরে আসে। ঘরে চুনের গন্ধ। বাইরে হাওয়ায় লাল সুরকি উড়ছে। পাশের ঘরে জোরে জোরে গান গাইছে

ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রীরা। আর একটু পরেই ফেকন ফিরে আসবে। উঠোনে পড়ে থাকা গেট দুটো টানাটানি করে বসাবে এঞ্জিনীয়ার সাহেবের নতুন লোক। সুবাসীর কপালের ঘাম নিজের গামছা দিয়ে মুছে দেয় জগু।

এত দরদ কেন রে?

কে আছে রে তোর সুবাসী?

কেন?

জানবার ইচ্ছা হয়।

উদাস শুষ্ক স্বরে সুবাসী বলে, কেউ নাই।

আমারও কেউ নাই, কান থেকে আধপোড়া বিড়িটা নিয়ে আবার নতুন করে ধরায় জগু, আমার ঘরে যাবি?

ধ্যেৎ—সুবাসী মিটি মিটি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মাটি ফাটা রোদ্দুরে। ছেঁড়া ময়লা শাড়ির প্রান্ত মাথায় তুলে ক্ষিপ্র হাতে সিমেন্ট গোলে। আর জগু লেবেল-পাটা নিয়ে আবার বসে যায় রাস্তার মাঝখানে। রোদের ঝাঁজ এখন আর তত জোরালো মনে হয় না ওর।

বিকেল বেলা। এঞ্জিনীয়ার সাহেব আবার আসে মেমসাহেবের সঙ্গে। মুখে হাসি নেই। রাগ-রাগ ভাব। মেমসাহেবও বেজার খুব। বেতের টেবিলে জোরে চাপড় মেরে কথা বলে। হাতের ধাক্কায় চায়ের ফ্লাস্কটা ছিটকে পড়ে মেঝের ওপর। গড়িয়ে গড়িয়ে বারান্দা থেকে নেমে আসে মাটিতে। ফেকন ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে আবার রাখে টেবিলের ওপর। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। গ্যারাজের গাঁথুনি কি ভাবে হবে, ঢোক গিলে জানতে চায়।

জোর ধমক দেয় এঞ্জিনীয়ার সাহেব, নিকালো!

মেমসাহেব তাল মিলিয়ে বলে, তোড় দেও মোকাম!

অপরাধ বুঝতে না পেরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে ঠিকাদার নেমে আসে। মেজাজের হদিস পায় না এঞ্জিনীয়ার সাহেবের। ওদিকে ঘরের সব আলোগুলি জ্বালাচ্ছে আর নেবাচ্ছে বিজলি বাতির লোকেরা। বিদ্যুৎ এসে গেছে নতুন বাড়িতে।

মেমসাহেব আর এঞ্জিনীয়ার সাহেব এদের কারুর সঙ্গেই কথা বলে না। কিছু বোঝায় না—কৈফিয়ত চায় না কোন কাজের। অনেকক্ষণ সেই বারান্দায় বসে জোরে জোরে নিজেদের মধ্যে কথা বলে শুধু। এরা মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকায়। ফেকন খৈনি ডলে হাতের মধ্যে। মিস্ত্রীরা খুশি মত মাপে মাপে গেট দুটো বসিয়ে দেয় ঠিক। জলের নতুন পাম্পটা ঘরের মধ্যে থেকে আজ আর কাউকে বাইরে নামিয়ে আনতে বলে না এঞ্জিনীয়ার সাহেব।

ঠেলা গাড়িতে এ বাড়ির মালিক আসল সাহেবের মালপত্র আসতে আরম্ভ করে পরদিন থেকে। সঙ্গে আসে বুড়ো বেয়ারা। আর একটা ছোকরা চাকরের সঙ্গে ধরাধরি করে জিনিস নামায়। সাজিয়ে রাখে ঘরের মধ্যে।

ছুটে এসে ফেকন জিজ্ঞেস করে, এঞ্জিনীয়ার সাহেব কই? পাম্প বসাবে না?

বিরক্ত হয়ে বুড়ো বেয়ারা বলে, আমি কি জানি? সাহেব আসবে এখুনি, তখন জিজ্ঞেস করিস।

বুড়ো বেয়ারা পাকা লোক। মনের মত করেই ঘর সাজায়। মেঝেয় কার্পেট পাতে। বড় বড় ছবি টাঙায় দেওয়ালে। গদিওলা চেয়ার সাজিয়ে রাখে ঠিক মত। সুবাসী চলতে চলতে উঁকি মেরে দেখে মাঝে মাঝে। শোবার ঘরে দুটো খাট পাতা হয়ে গেছে। কী পুরু গদি! পাখা চলছে বনবন করে। বেয়ারা নিজে হাওয়া খাবার জন্যে ইচ্ছে করে খুলে রেখেছে বোধ হয়। এইবার আসবে সাহেব—মেমসাহেব। মনের সুখে বসবাস করবে এ বাড়িতে। তখন অবশ্য সুবাসীর কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওদের দেখতে পাবে না সে। তবে মেমসাহেবের রূপটা বড়ই মনে ধরেছে তার। তার দিকে তাকিয়ে থাকলে সে কাজের কথাই ভুলে যায়। মোটরগাড়ির আওয়াজ শুনলেই মাথা তোলে সুবাসী। ওই বুঝি ওরা এল।

মোটরগাড়ির আওয়াজ হয় বটে। ঠিক একটু পরেই সেই গাড়িটাই এসে দাঁড়ায় গেটের সামনে। মেমসাহেব নেই আজ, এঞ্জিনীয়ার সাহেবও নেই। এ বাড়ির মালিক, যাকে সুবাসী আগে কখনও দেখে নি, সে নামে গাড়ি থেকে। সঙ্গে আরও একজন সাহেব। যেমনি লম্বা তেমনি মোটা।

সুবাসীর মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যায়, এ আবার কে ?

চুপ চুপ, কাজে বেশী করে মন দেয় জগু, এই সাহেবেরই তো বাড়ি—ঢ্যাঙা মানুষটারে দেখি নাই আমি।

কিন্তু সেই ঢ্যাঙা মানুষটাই কথা বলে ফেকনের সঙ্গে। লোক লাগিয়ে বাইরে আনে জলের পাম্প। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে। তারপর বসিয়ে দেয় চানের ঘরের পাশে। ঘন ঘন সিগারেট খায় সেই সাহেব। নতুন এঞ্জিনীয়ার। ফেকন চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছে। বাড়ির মালিক কিছু দেখে না। কথা বলে না কারুর সঙ্গে। চশমা ঠিক করে বারান্দায় সেই বেতের চেয়ারে মোটা একটা বই খুলে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আজ থেকে এখানেই বাস করবে বাড়ির মালিক।

আবার একবার ঢোক গেলে ফেকন, এঞ্জিনীয়ার সাহেব আসবেন না ? গ্যারাজর গাঁথুনি—

বই পড়তে পড়তে মাথা তুলে বাড়ির মালিক গম্ভীর স্বরে বলে, এই যে, নতুন এঞ্জিনীয়ারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এবার থেকে ইনিই আসবেন—

জী হুজুর, আবার একটা লম্বা সেলাম ঠোকে ফেকন। গ্যারাজ কেমন করে তৈরী করতে হবে সেকথা বুঝিয়ে দেয় বটে নতুন লম্বা এঞ্জিনীয়ার। ফেকনের মাথা ঠিক, সে বুঝেও নেয় এক মিনিটেই সব ব্যাপারটা। কিন্তু পুরনো সাহেবকে কেন বরখাস্ত করলো মালিক ঠিক কাজ শেষ করবার আগে আগে, শুধু সেকথাটা সে ভেবে পায় না।

এ বাড়ির আসল সাহেব যাকে অনেক দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে

ছিল সুবাসীর, তাকে সে দেখলো শেষ অবধি। সাহেব আছে এ বাড়িতেই। আলো জ্বলে, পাখা চলে, বোঁ বোঁ শব্দ করে জলের পাম্প —মোটরগাড়ি যায় আর আসে। কত চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারি, বড় বড় আয়না আর বাসনপত্তর! সবই দেখেছে সুবাসী গালে হাত দিয়ে হাঁ করে কাজের কথা ভুলে। শুধু মেমসাহেবকে আর দেখতে পায় না সে। বাড়ি শেষ হল কিন্তু মেমসাহেব গেল কোথায়? জগু বলে, সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে মেমসাহেবের। মেমসাহেব গিয়ে উঠেছে এঞ্জিনীয়ার সাহেবের বাড়ি। তাই রাগে তাকে বরখাস্ত করে দিয়েছে সাহেব। বুড়ো বেয়ারার মুখ থেকে এসব কথা শুনে ফেকন বলেছে জগুকে।

কিন্তু তবুও জগুর কথা বিশ্বাস করে না সুবাসী। ঝগড়া করে গেছে বটে এখন মেমসাহেব কিন্তু তার মনে হয়, আবার দুদিন পরে ফিরে আসবে ঠিক। দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন সুন্দর পাকা বাড়ি করালো মেমসাহেব—এখন নিজে সেখানে বাস করতে আসবে না—তা কি হতে পারে! জগুটা কিছু জানে না বুঝি!

ফেকনের কাছ থেকে শেষ দিনের মজুরি নিয়ে ভিজে দৃষ্টিতে জগু তাকায় সুবাসীর দিকে। এ বাড়ির কাজ আজ শেষ। আবার কবে নতুন কাজ পাবে ওরা জানে না। আর সুবাসীও কোথায় যাবে ঠিক নেই। ফেকনের মতিগতি বোঝা ভার। জগু আস্তে ডাকে, এ সুবাসী?

কী?

যাবি?

কোথায়?

আমার ঘরে।

খাওয়াবি কি?

জগু হেসে বলে, হাওয়া।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে

গেট খুলে বাইরে আসে সুবাসী। পিছনে পিছনে জগুও। ঠিকাদার দেখছে কিনা কে জানে। দেখলে দেখুক। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তখন গাছের কচি পাতা নড়ে ওঠে।

একটু এগিয়ে গিয়েই বস্তি। মাটির ঘর। তুলসী গাছ একটা আছে বটে জগুর ছোট উঠোনে। সুবাসী তাকায় এপাশে ওপাশে। অন্ধকারে। ভিজে চোখে। মাটির দেওয়াল। পাতলা তারে ঘেরা জানলা। দেশলাই বের করে ঝুল ধরা একটা লণ্ঠন জ্বালায় জগু। টিনের থালায় তুটো নাড়ু বের করে দেয় সুবাসীকে। আর তখন কাছাকাছি কোথাও এক সঙ্গে অনেক শেয়াল ডেকে ওঠে।

তোর ঘরে আর যাবার দরকার নাই সুবাসী—ওখানের পাট তুলে দে—

ধ্যেৎ—

কেন আমি মন্দ লোক নাকি রে ?

তুই জানিস। আমাকে লোকে মন্দ বলবে না ?

উঃ—মাথায় সিঁতুর দিলে লোকে মন্দ বলে ? জগু হাসে, চল, যাবি কালীঘাটে ?

আবার সুবাসী বলে, ধ্যেৎ !

কিন্তু এবার লণ্ঠনের মিটিমিটি আলোয় জগুর ঘরটা ভাল করে দেখে নেয় সুবাসী। মেঝেতে বড় গর্ত হয়েছে একটা। দেওয়ালে মস্ত ফাটা দাগ। একদিক ধসে পড়েছে। পড়ুক। যেন সুবাসী ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে সোজা করে দিতে পারে ওটা। জগুর পায়াভাঙা তক্তপোশে বসে হঠাৎ মনে অনেক জোর পায় সে। মিটিমিটি লণ্ঠনটাও যেন জোর পায়। আর বাইরের হাওয়াও জোর করে ঢুকতে চায় ঘরে, মাটির ফাটা দেওয়াল আর তার বসানো এক ফালি জানলার বাধা না মেনেই।

১৬ই সেপ্টেম্বর : ১৯৫৮
মঙ্গলবার সকাল : কলিকাতা

॥ প্রতিক্রিয়া ॥

কৃষ্ণচূড়ার লাল চূড়ায় যখন হেলে-পড়া সূর্যের আলোর রেখা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকে আর শহরতলির ঘোড়দৌড়ের মাঠের একদিকে বড় বড় গাছের পাতায় সবুজ-লালচে রঙের আভা ঝলসায় তখন জানলার পর্দা আর একটু ভাল করে টেনে দেয় সন্ধ্যা।

বাইরে তাকিয়ে সময় বোঝা যায় না। একটু আগে ঢং ঢং করে কটার ঘণ্টা বাজল কে জানে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ো চাকরটা কোথায় বেরিয়েছে—এখনও ফেরে নি। রোজই দেরি করে ফেরে। অন্ধকার হবার ঠিক আগে-আগে। তা ফিরুক। সন্ধ্যার এ সময় তাকে কোন দরকার হয় না। রমেন ফেরে অনেক পরে।

বাইরের এলোমেলো হাওয়া ধুলো ওড়াক—ঠাণ্ডা আলো পড়ুক পুকুরের জলে—ঘর থেকে দু পা বেরিয়ে ঝিমঝিম ভারী মাথাটা একটু হালকা করে আসবার কোন ইচ্ছে সন্ধ্যার হয় না। আস্তে আস্তে পা ফেলে রান্নাঘরে গিয়ে দেখে উনুনে একটু আঁচ আছে কি না। নিজেই এক কাপ চা করে সকাল বেলা আনিয়ে রাখা দুটো বিস্কুট মুখে দেয়।

ঘর একেবারে অন্ধকার। থেমে থেমে এদিক-ওদিক থেকে একটা একটা করে মশা আসে। তখন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সন্ধ্যা ঠিক করে আলো জ্বালিয়ে দেয়। আর কান দুটো ঠিক রাখে—চাকর ফিরে এল কিনা।

তার নিজের কোন কাজ নেই এখন। একটু পরে আয়নার সামনে বসে সে টেনে টেনে অনেকক্ষণ ধরে চুল বাঁধবে। স্নানের ঘরে গিয়ে আরামে নিজের গায়ে ঠাণ্ডা জলের ছিটে দেবে ইচ্ছে মত।

•বেরিয়ে এসে মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে হয়তো একা একা বসে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টে যাবে যতক্ষণ রমেন না আসে ততক্ষণ। আর মাঝে মঝে রান্নাঘরে গিয়ে চাকর কি করছে না করছে তদারক করবে। তা ছাড়া এখন আর কাজ কি সন্ধ্যার?

তবু সে কান দু'টা ঠিক রাখে—চাকর এল কিনা। যদি হঠাৎ কড়া নড়ে ওঠে—যদি কেউ এসে ডাকে রমেনকে তাহলে লজ্জার ঠাণ্ডা একটা স্রোত সিরসির করে নামবে তার শরীর বেয়ে। কাটা-কাটা অস্বস্তিতে ঘরের এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকবে নিশ্চল হয়ে। অচেনা মানুষকে মুখ ফুটে বলতে পারবে না যে রমেন বাড়ি নেই। কতবার এমন হয়েছে। কতবার রমেন রূঢ় আঘাতে সংশোধন করবার চেষ্টা করেছে তাকে। কিন্তু মনের মধ্যে সব-সময়-চাপানো লজ্জার বোঝাটা কিছুতেই নামিয়ে ফেলতে পারে নি সন্ধ্যা।

ছি ছি, একবার দরজা খুলে বসতে বলতে পারলে না ওকে? অতদূর থেকে এসেছিল বেচারি—

আমি কি করব, রমেনের কর্কশ স্বর শুনে সন্ধ্যা তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস করে না, বেহারী ছিল না তখন—

তুমি তো ছিলে, আরও কঠিন হয়ে ওঠে রমেনের ভাষা, এমন করলে আমার ব্যবসা চলবে কি করে? কে কি দরকারে এল না এল আমি তো জানতেই পারবো না।

ওদের তোমার আপিসে যেতে বললেই তো পার—

বন্ধুবান্ধব সব আমার আপিসে আড্ডা মারতে যাবে নাকি? রমেন চিৎকার করে উঠে, একটা কাজ পাওয়া যায় না তোমাকে দিয়ে। আমাকে কোন রকম সাহায্য করতে পার না। দিনরাত রান্না ঘরে গিয়ে টিনির-টিনির করা আর জবুথবু হয়ে ঘরের মধ্যে ঘোমটা টেনে বসে থাকা—আশ্চর্য!

মাথা তুলতে পারে না সন্ধ্যা। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় শুধু শরীর কাঁপতে থাকে। কিছু বললেই গলার স্বর আরও তুলবে রমেন।

তাকে গাঁয়ে গিয়ে বাস করবার উপদেশ দেবে। সামান্য ভদ্রতাজ্ঞান যার নেই, শহরে থাকবার কোন মানে হয় না তার। রেগে আবার বেরিয়ে যাবে রমেন। ফিরবে অনেক রাত করে। এসে দেখবে তখনও ঘুমোয় নি সন্ধ্যা। না খেয়ে বসে আছে তার অপেক্ষায়। একটুও খুশি হবে না সে। চোখা-চোখা কথার তীর ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু উত্তরে সন্ধ্যা আর একটা কথাও বলবে না।

আয়নার সামনে বসে মাথায় চিরুনি চালাতে চালাতে এমন অনেক কথা মনে ভিড় করে আসে। আর আয়নার একটু কাছে সে এগিয়েও আসে। নিজেকে দেখতে দেখতে সে ভাবে এত লজ্জা কোথা থেকে জমা হল তার রোমকূপে। তার চেহারা অদ্ভুত কিম্বা আশ্চর্য রকম ভাল নয় যে, রাস্তায় বার হলেই সহস্র জোড়া চোখ পড়বে তার ওপর—প্রত্যেকটি লোক তাকে দেখবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। যাব বুঝলেও রাস্তায় সহজ হয়ে চলতে পারে না সন্ধ্যা। রাস্তায় বার হলেই তার পা কাঁপে। কোনদিকে মাথা তুলে সে তাকাতে পারে না। আর রমেন তখন বিরক্ত হয়। সেকথা বুঝেও লজ্জা ঝেড়ে ফেলে সোজা হয়ে হাঁটতে সে পারে না।

চাকরটা ফিরে এসেছে। রান্নাঘরে বাসনের ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। সন্ধ্যে হয় হয়। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে এর মধ্যেই। চুল বাঁধা শেষ করে সন্ধ্যা স্নানের ঘরে যাবে কি না যাবে ভাবছে, এমন সময় স্লিপারের খসখস শব্দ। সামনের বাড়ির চালাক-চতুর বউ লতিকা সোজা চলে আসে ঘরের মধ্যে। অল্প একটু সিঁদুরের ছোঁয়া। ঘোমটা নেই। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ। এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ায় সারাদিন। ওকে দেখেও সন্ধ্যার গা ছমছম করে! এখুনি তাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে।

কী করেন সারাদিন বাড়ি বসে? দুটি লোকের তো সংসার—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

লতিকা গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে, দূর কিছু

হয় নি, কিন্তু এমন করে বাড়ি বসে থাকেন কেন? শরীর তো খারাপ লাগবেই—

না, না, শরীর খারাপ লাগে না আমার, একটু থেমে মুখ নামিয়ে সন্ধ্যা বলে, আর উনি কখন আসেন না আসেন—

উনি এলেনই বা? আমার সঙ্গে এই কাছাকাছিই তো ঘুরবেন। উনি এলে ছুটে চলে আসবেন ভেতরে।

না না, আজ থাক।

আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো? লতিকা যেন গায়ে পড়েই একটু বেশী কথা বলে, রোজই তো একটানা একটা ছুতো করে ঘরে বসে থাকেন। আমি এতবার এলাম, একদিনও গেলেন না আমাদের বাড়ি, সে হেসে বলে, অথচ আমারও একটা জেদ চেপে গেছে আপনাকে টেনে ঘরের বার করবো।

সে আর এমন কথা কি? বেশ তো। বেরুনো যাবে একদিন।

হালকা স্বরে লতিকা হেসে বলে, একদিন নয়। আজই চলুন— সে উঠে দাঁড়ায়, বাইরে ফুরফুরে হাওয়া। আকাশে ছোট একফালি চাঁদ। আর অল্প অন্ধকারে পুকুরের কালো জল কেমন টলমল করছে দেখবেন চলুন—

শরীরটা আজ ভাল নেই যে।

বন্ধ ঘরে বিকেল বেলা বসে-বসে ঘামলে শরীর ভাল থাকে কখনও? আপনার মত মানুষ আমি আর দেখি নি। কে আছে আপনাকে বাধা দেবার? কড়া শাশুড়ি নেই। ছেলেমেয়ে নেই। ব্যস্ত স্বামী কাজ সেরে কখন ফিরবেন তারও ঠিক নেই! কিসের জন্যে ঘরে বসে শরীর ভাঙেন আপনি? আপনার ভাবনায় আমারই যে ঘুম হয় না—

কি একটা বলতে যাচ্ছিল সন্ধ্যা, কিন্তু জুতোর খটখট আওয়াজে চমকে উঠে সে তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা টেনে দেয়। রমেন ফিরেছে। শরীরটা কাঠের মত শক্ত হয়ে যায় সন্ধ্যার। ঘরে ঢুকতে গিয়ে

থমকে দাঁড়ায় রমেন। লতিকাকে দেখে ঢুকবে কি না ঢুকবে ভাবে।

আর তখন জোরে হেসে উঠে লতিকা বলে, আপনার স্ত্রীকে একটু খোলা হাওয়া গায়ে লাগাবার পরামর্শ দিচ্ছি।

হাসি মুখে ঘরে ঢোকে রমেন, দেখুন যদি পারেন। অনেক চেষ্টা করে আমি তো কিছুই করতে পারলাম না। একটু থেমে লতিকাকে দেখতে দেখতে রমেন বলে, শুধু মানুষকে নয়, পশুপাখি গাছপালা সব কিছুকেই ও লজ্জা করে—

লতিকা উঠে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রমেনকে লক্ষ্য করে বলে, যাক, এখন আপনি এসে পড়েছেন। আমার কাজ শেষ। এবার আপনি ওর লজ্জা ভাঙবার চেষ্টা করুন। আমি যাই।

বসুন, বসুন—রমেন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, চা খান।

যেন মাটির দিকে তাকিয়ে পা ফেলে সন্ধ্যা। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দিকে। লতিকার সামনে রমেনের সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারে না। কিন্তু লতিকাকে অসহ্য মনে হয় তার। মেয়েদের স্বভাবসুলভ লজ্জাও নেই তার শরীরে। এমন সুরে রমেনের সঙ্গে কথা বলছে সে, যেন সে তার কতকালের চেনা। দেখেছে তো মাত্র দু একদিন। কথা বলেছে একটা কি দুটো। এখন এত আত্মীয়তা করবার কোন মানে হয়?

সন্ধ্যার কথা ভেবে যেন ওর ঘুম হয় না। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আসে কে জানে।

চা খেয়ে লতিকা চলে যাবার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে রমেন, দেখতো কী সুন্দর।

ছাই সুন্দর, এবার সন্ধ্যা সহজ হয়ে ওঠে, আপিসের টাকা চুরি করে স্বামী জেলে বসে আছে—বাইরের লোকের কাছে মুখ দেখাতে একটু লজ্জাও করে না—

লজ্জা করবে কেন? ওর কি দোষ? স্বামী চুরি করেছে—স্বামী

ভুগুক। তা বলে আর একটা জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে নাকি! ইস্কুলে চাকরি করে সংসার তো চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক।

সন্ধ্যা চুপ করে থাকে। হঠাৎ ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটায় জানলার পর্দা উঠে যায়। এক টুকরো ঘাস উড়ে আসে ঘরের মধ্যে। ভয় পেয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে গেল একটু আগে। সেই ভীত কোলাহল এখনও যেন সন্ধ্যার কানে লেগে থাকে। রমেনের কথার মধ্যে তাকে খোঁচা দেবার যে একটা চাপা উদ্দেশ্য আছে সে কথা বুঝতে তার দেরি হয় না। থাকে থাক। সন্ধ্যার কিছু করবার নেই। তার নিজের জীবন ব্যর্থ হোক বা না হোক—লতিকাকে বোধ হয় কোন দিনও সে অনুকরণ করতে পারবে না।

কিন্তু কেন সে নিজেকে সমস্ত পৃথিবীর কাছ থেকে এমন করে আড়াল করে রাখে? সে তো রমেনের জন্যই। আর কেউ তার দেহ মনের এক কণা স্বাদ পাবে না—শুধু রমেন তাকে দেখুক। ভিড় আর সূর্য, আলো আর পথ, গাছ আর জল—রমেন ছাড়া কারুরই তাকে যেন তেমন করে দেখবার অধিকার নেই।

একটু-একটু করে মাথার ঘোমটা খসে পড়ে সন্ধ্যার। জোর আলোর নিচে বসে সে মাঝে মাঝে তাকায় রমেনের দিকে! কিন্তু তার মুখে বিরক্তির সুস্পষ্ট রেখা। রুমাল বের করে কপালের ঘাম মোছে। একবারও তাকায় না সন্ধ্যার মুখের দিকে। তখন লজ্জার আর একটা ঢেউ তার বুক ভেঙ্গে তাকে এখান থেকে ভাসিয়ে নিতে চায়। কে তাকে দেখবে।

দেহ আর মনের ওপর থেকে একটা পুরু আবরণ যেন মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে সরে যায়। আর তখন ঘোর লাগে সন্ধ্যার চোখে। বাইরে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে না করলেও ঘরের মধ্যে খাট আলমারি দুলে ওঠে চোখের সামনে!

ভয়ে-ভয়ে সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করে, কি হল?

একটুর জন্যে হল না, অন্য আর এক জনের ঘাড়ে সঙ্গে সঙ্গে দোষ চাপিয়ে দেয় রমেন, বাঙালীকে বিশ্বাস নেই। আমার সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করে সরে পড়ল—

সন্ধ্যার মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে, দু হাজার টাকার কিছুই ফেরত পাবে না তুমি ?

অনুতাপের কোন প্রকাশ নেই রমেনের স্বরে, কত টাকা তো হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল—ওই রায় চৌধুরীর জন্যে—রাস্কেলটা এখন আমার টাকায় নবাবী করবে—

কিন্তু ধার শোধ করবে কেমন করে ?

রমেন জোরে হেসে ওঠে, আরে এখনও অনেক সময় আছে। আমি কি ততদিন চুপ করে বসে থাকব ?

একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে রমেন বলে, তবে এবার আর বাঙালী পার্টনার নয়, খোদ পার্শী—কোটি কোটি টাকার কারবার।

কিন্তু এবার রমেনের ব্যবসাটা কি হবে—কত হাজার টাকা পাবে সে, একবারও সে-সম্পর্কে কোন কৌতূহল হয় না সন্ধ্যার। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে শুধু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, আর টাকা পাবে কোথায় ?

টাইটা হেঁচকা টানে খুলে আলনায় ছুঁড়ে দিয়ে রমেন বলে, সে একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নেব এখন। যাক্‌গে, আমি ভীষণ ক্লান্ত। বেহারীকে বল তাড়াতাড়ি খাবার দিয়ে দিতে।

থেমে থেমে সন্ধ্যা আবার বলে, নরু মামা বলছিলেন ওঁর সন্ধানে একটা ভাল চাকরি আছে—

চাকরি ? তোয়ালে কাঁধে নিয়ে রমেন ঘুরে দাঁড়ায়, তা কি হবে ?

হ্যাঁ, মানে অন্তত কয়েক মাসের জন্যে তুমি যদি সেটা নাও—শেষ অবধি সব সঙ্কোচ মুছে সন্ধ্যা বলেই ফেলে, সংসার খরচের জন্যে এমাসে টাকা তো নেই একেবারে—

সন্ধ্যাকে থামিয়ে দিয়ে বিকট স্বরে হেসে ওঠে রমেন, কত মাইনে দেবে? হাজার? দু-হাজার?

বলছিলেন, পাঁচ শো টাকা।

দুদিন পরে আমি ওর চেয়ে বেশী মাইনে দিয়ে লোক রাখব। ওসব বাজে চাকরি-বাকরি আমার দ্বারা হবে না। খেতে না পাই তাও স্বীকার। তুমি একটু বেশী ঘাবড়াও সন্ধ্যা। ব্যবসা রাতারাতি হয়? এই দেখ না, আর কিছুদিনের মধ্যে চাকা আমি একেবারে ঘুরিয়ে দেব—এবার আর আজে-বাজে লোক নয়—একেবারে পার্শী পার্টনার—সন্ধ্যাকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে বাথ-রুমের দরজা বেশ জোরেই বন্ধ করে রমেন। জলের ছড়ছড় শব্দ আসে। গুনগুন গানের কলিও শুনতে পায় সন্ধ্যা।

তখন সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে লুকোবার একটা নিরাপদ জায়গা আছে কি-না। অস্বাভাবিক লজ্জার সঙ্গে তার মনে কোথা থেকে একটা অদ্ভুত ভয় এসে মেশে। আলোটা নিবিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। আর মনে হয় অন্ধকারেও সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

একদিন নয়, দুদিন নয়—মাসের পর মাস। আজ দেড় বছর ধরে সেই এক কথা—সেই একই আশ্বাস। চাকরিতে টাকা হয় না। জীবনে কোনদিন গোলামি করতে পারবে না রমেন। সন্ধ্যা যদি একটু কষ্ট করে, একটু ধৈর্য ধরে তাহলে ব্যবসা করেই আস্তে আস্তে সে গাড়ি করবে, বাড়ি করবে, পৃথিবীর নানা দেশে তার আপিস থাকবে আর লাখ-লাখ টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করবে সন্ধ্যা। কিন্তু এখন যদি চাকরিতে ঢোকে তাহলে সমস্ত ভবিষ্যৎটাই নষ্ট হয়ে যাবে রমেনের। আর পাঁচজন বাঙালীর মত কুকুর-বেড়ালের জীবন কাটাতে সে পারবে না কিছুতেই।

প্রথম প্রথম এসব কথা শুনতে শুনতে রমেনের মত সন্ধ্যার চোখ দুটোও জ্বলজ্বল করত! টাকার স্বপ্নে না হোক, নির্ভয়ের

অদ্ভুত একটা স্বাদে তার শরীরটা যেন ঝিমিয়ে আসত! সে দেখত ঘরের উঁচু দেয়াল। জোরালো আলোর বালব্। রমেনের দীর্ঘ চেহারা। সতেজ একটা মানুষ। তার প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার ঝলকে মধুর একটা ঘ্রাণ কাঁপত।

এই তো কিছুদিন আগেকার কথা! মাত্র দেড় বছর। সবই তখন উৎসাহী হয়ে শুনত সন্ধ্যা—সবই জানত। কিছুদিন গেল নাট-বল্টু চালানেব ব্যবসায়। নিজের জন্যে দামী দামী কাপড় বানায় রমেন। বাইরে বাইরে খায়। একটা গাড়ি কিনে ফেলবে কিনা হঠাৎ ঠিক করতে পারে না। মাসে মাসে দেড়শো-দুশো টাকা ট্যাক্সি ভাড়া বেরিয়ে যায়। রমেনের এখানে ওখানে ছুটোছুটির কামাই নেই। বার বার সন্ধ্যাকে আশ্বাস দেয়, এই তো সবে শুরু। দেখনা শেষ অবধি কোথায় গিয়ে দাঁড়াই। ইডিয়টগুলো এখনও বলে কি-না বাঙালীর ব্যবসায় মাথা নেই। কিন্তু সন্ধ্যাকে নিয়ে বেরুতে গেলেই বাধে গোলমাল।

না না, আমি কোথাও যেতে পারব না!

সে কি, কাপড়ের পুটলির মত সারাদিন তুমি ঘরের এক কোণায় পড়ে থাকবে, তা কি হয়?

হ্যাঁ, হয়।

তোমার মত এমন অদ্ভুত মেয়ে আমি কখনও দেখি নি, বিরক্তির ঝাঁজ ঝরে রমেনের কথায়, কিন্তু আমার বন্ধুরা যে তোমাকে দেখতে চায়—তার কি হবে?

ওদের একদিন বাড়িতে আসতে বললেই তো পার।

তাহলে আমার লজ্জা করবে, মুখ বিকৃত করে রমেন বিদ্রূপ করে সন্ধ্যাকে, বাড়িতে লোক এলে তুমিই তো সকলকে আপিসে যাবার উপদেশ দাও—

কি করব, সন্ধ্যার গলায় থমথমে স্বর কাঁপে, কত মেয়েই তো লোকের সামনে বার হয় না—

তর্ক করতেই শিখেছ শুধু, কপালের রেখাটা পুরু হয়ে ওঠে রমেনের, কেন তোমার এত লজ্জা বুঝি না। আমি কি চুরি করে জেলে গেছি তোমার ওই লতিকার স্বামীর মত ?

ওগো আমি পারি না, সন্ধ্যার চোখ দুটো ভিজে ওঠে, কারুর সঙ্গে কথা বলতে আমি যে কিছুতেই পারি না—

কি পার তুমিই জান, রমেন সেখান থেকে সরে যায়।

তারপর একদিন একটু বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে রমেন। কয়েকদিন থেকে চলাফেরার গতিও বেশ শ্লথ হয়ে এসেছে। ঠোঁটের ওপর রেখা দুটোও স্পষ্ট হয়েছে। গলার স্বরে তেমন জোর নেই। খেতে খেতে কি ভাবে। এদিক-ওদিক তাকায়। দু-চারদিন বাড়িতে বসে টিনের পর টিন সিগারেট শেষ করে। সন্ধ্যা কিছু জিজ্ঞেস করলে স্পষ্ট উত্তর দেয় না! একটু হেসে বলে, বিশ্রাম করছি।

একসময় মুখ থেকে খেলিয়ে খেলিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যার সামনে এসে দাঁড়ায় রমেন। একটু ইতস্তত করে প্রথমে। তারপর সহজভাবে জিজ্ঞেস করে, কত টাকা আছে তোমার কাছে ?

বইয়ের আলমারীর ওপরে রাখা ফুলদানিটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সন্ধ্যা বলে, ঠিক বলতে পারি না। শ-দুয়েক হবে বোধ হয়! কেন বল তো ?

মোটে দুশো ? অবাক হয়ে রমেন তাকায় ক্যালেণ্ডারের দিকে। তারিখ দেখবার জন্যে নয়। মুখ দেখে মনে হয় সেটা যেন ওর খুব ভাল করেই জানা আছে। সেদিকে তাকিয়ে অন্য কথা ভাবে সে। কি ভাবে সন্ধ্যা তা জানে না।

ফুলদানিটা ঠিক জায়গায় রেখে রমেনের পাশে দাঁড়িয়ে সে আর একবার জিজ্ঞেস করে, কেন ?

না, মানে—প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয় রমেন, নাট-বল্টুর ব্যবসা করতে ভাল লাগছে

না। যত ছোটলোক নিয়ে কারবার। বোকাদের সঙ্গে মতেও মেলে না আমার—

বাধা দিয়ে সন্ধ্যা বলে, কেন লাভ তো বেশ ভালই হচ্ছে।

আরে দূর, ফার্নিচারের ব্যবসা করলে ওর চার ডবল লাভ হবে, থেমে যায় রমেন। ওপরে তাকায়। দেয়াল বেয়ে বেয়ে একটা টিকটিকি উঠছে। একটু একটু ঝুল জমেছে কোণায় কোণায়। দরজার বাইরে একটা অচেনা যন্ত্র বাজিয়ে বেসুরো কীর্তন গাইছে বোধ হয় সেই বুড়ো ভিখারী। দু এক মিনিট পর রমেন আবার বলে, কিন্তু মোটে দু-শো টাকা—আর সব উড়ে গেল এর মধ্যে ?

সব তো তুমিই নিয়ে নিলে। আজ এ কেনো, কাল ও কেনো। কথায়-কথায় ট্যাক্সি। ঘনঘন বাইরে খাওয়া—

থাক থাক, এখন ওসব শুনে কোন লাভ নেই। ব্যবসা করতে গেলে একটু চাল বজায় রাখতে হয় বইকি !

নিশ্চয়ই, অসহিষ্ণু গলার স্বর সন্ধ্যার, বিপদ-আপদের জন্যে কিছু টাকাও তো জমিয়ে রাখা দরকার।

আছে—আছে ব্যাঙ্কে। তিন বছরের জন্যে ফিক্সড ডিপোজিট। ওটা ভাঙতে চাই না বলেই তো—যাকগে, এখন দু-শো টাকাই দাও আমাকে—

বাড়িতে যে আর কিছুই থাকবে না তা হলে ?

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে রমেন বলে, কাল পরশুই আবার টাকা দেব তোমাকে।

কিন্তু সে-টাকা আর সন্ধ্যার কাছে ফিরে আসে না। আর সংসারেব চাকাটাও যেন থমকে থেমে যায়। তখন বুড়ো চাকরের সামনেও মুখ বার করতে লজ্জা হয় সন্ধ্যার। একটা ছুতো করে মুদীর দোকান থেকে ধারে জিনিস আনায় বটে কিন্তু মনে মনে ভাবে তার গোটা কয়েক চুড়ি কাউকে দিয়ে বিক্রি করিয়ে টাকা নিয়ে এলে মানটা বাঁচত। রমেন কিন্তু একেবারে নির্বিকার।

কিছু বলতে গেলেই বলে, আর দু-একটা দিন—আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে—

দু-একদিন পর রমেন যেন একটু বেশী রকম ছটফট করে। বারবার সন্ধ্যাকে শুনিয়ে বলে, লোকে সুযোগ পায় না—আর আমি সুযোগ পেয়ে কিছু করতে পারছি না। ঠিক এই সময় বদমাইশ-গুলো ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ল—কথা দিয়ে কথা রাখল না—

কি হল? আস্তে জিজ্ঞেস করে সন্ধ্যা।

হবে আবার কি, মোটে পাঁচশো টাকার জন্যে আমার সব আটকে আছে। ফার্নিচারের এত অর্ডার পেয়েছি যে এবার আমাকে কেউ রুখতে পারবে না। কি করি বল তো?

ব্যাঙ্ক থেকে তোল, রমেনকে যেন একটা ভুলে যাওয়া কথা মনে করিয়ে দেয় সন্ধ্যা, সে দিন যে বলেছিলে—

তিন বছরের আগে ওটা ভাঙাবার একেবারেই ইচ্ছে নেই আমার, রমেন যেন জোর করে হাসে, তোমার কথা ভেবেই ওটা জমিয়েছি। বেশ অনেক হাজার টাকা—কত টাকা সেটা আর বলে না রমেন।

ভাবনা হয় সন্ধ্যার। স্বামীর জন্যে একটা কিছু করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। রমেন তার কাছে মাঝে মাঝে এমন পরামর্শ চায় বলে খুশিতে ঝকঝক করে কিন্তু কি করবে ঠিক করতে পারে না।

কি করবে? সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করে, ছোড়দাকে একবার বলব। পাঁচশো টাকা আমি বললে এক কথায় বের করে দেবে, কিন্তু—

না না, হঠাৎ রমেন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, শালা-টালার কাছ থেকে আমি টাকা ধার করতে পারব না—

তা হলে?

দেখা যাক, জোরে জোরে সিগারেটে পরপর কয়েকটা টান দিয়ে থেমে থেমে রমেন বলে, এমন ভাবনা আমার জীবনে কখনও হয় নি—

তার গায়ে আস্তে একটা হাত রেখে সন্ধ্যা বলে, আমার কয়েকটা চুড়ি বিক্রি করে দাও—

দূর তা কি হয় ?

খুব হয়। পরে আবার গড়িয়ে নিলেই হবে এখন। কিন্তু ব্যবসার এমন সুযোগ তুমি তো আর নাও পেতে পার।

তা ঠিক ।

হাসিমুখে কয়েকটা চুড়ি খুলে দেয় সন্ধ্যা। যেন কত অনিচ্ছায় হাত বাড়ায় রমেন! লোকে শুনলে কি বলবে। এমন জঘন্য কাজ করতে বুক ভেঙে যাচ্ছে তার। এগুলো সে বিক্রি করতে পারবে না! কোথাও বন্ধক দেবে! সাত দিনের মধ্যে ছাড়িয়ে এনে আবার তুলে দেবে সন্ধ্যার হাতে। এমন কাজ জীবনে আর নয়।

কিন্তু এমন কাজ আরও অনেকবার করে রমেন। পাঁচশো টাকায় ঠিক হয় না। হাজার টাকার দরকার হয়। নিজেই সে সন্ধ্যাকে বোঝায় যে গয়না বাড়িতে পড়ে থাকাও যা দোকানে বন্ধক থাকাও তাই। একবারে সব ফিরিয়ে আনবে সে। বড় করে ব্যবসা করতে গেলে বেশী টাকা দরকার। তবুও সে ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙে না, সন্ধ্যাকে ভালবাসে বলেই তো।

কিন্তু ফার্নিচারের ব্যবসাও নাকি তেমন সুবিধের নয়। কাঠের গোলায় গিয়ে দিনরাত ভ্যাপসা গন্ধ শোঁকা রমেনের কাজ নয়। এবার এক বন্ধুর মাছের ভেড়ির সন্ধান পেয়েছে সে। কলকাতার বড় বড় হোটেলে মাছ চালান দিতে পারলে বছরের মধ্যে সে বারবার প্লেনে বিলেত যাবে—আসবে। ছেলেমেয়ে হলে তাদের লেখাপড়া শেখাবে সেখানেই। কিন্তু যেমন করে হোক দু-হাজার টাকা যত তাড়াতাড়ি হয় জোগাড় করতেই হবে। বন্ধুকে নতুন মাছের চারা কেনবার জন্যে দিতে হবে হাজার খানেক। আর এক হাজার টাকা খরচ করতে হবে বড় বড় হোটেলের ম্যানেজারদের খুশি করবার জন্যে। টাকাটা কেমন করে জোগাড় করতে হবে সে-বিষয়ে সন্ধ্যার কাছে পরামর্শ চায় রমেন।

অত টাকার গহনা তো আমার নেই—ভিজে ঠাণ্ডা স্বরে সন্ধ্যা বলে।

না না, গয়না কেন—আরে গয়না হবে এখন আবার। এবার যা লাভ হবে, বুঝলে—তুমি কল্পনা করতে পারবে না। আমি ভাবছিলাম—

কি ?

তোমার ছোড়দাকে একবার বলবে নাকি ? মানে—এই ধর আমি—কি ভেবে রমেন বলে, কদিন আর ? দু-দশ দিনের মধ্যেই ফেরত দেব।

যদি দেরি হয় ? একটু ইতস্তত করে সন্ধ্যা জিজ্ঞেস করে।

পাগল নাকি—এবার আর দেখতে হবে না।

তবুও ইতস্তত করে সন্ধ্যা, ব্যবসার ব্যাপার তো—কখন কি হয় বলা যায় না। যদি ঠিক সময় দিতে না পার—তার চেয়ে ব্যাঙ্কের টাকাটা—

আঃ হা, ওটার কথা তুমি ভুলে যাও। অত সুদ নষ্ট করবার কোন মানে হয় ? আর তা ছাড়া ওটা যে তোমার জন্যে আলাদা করে রেখেছি। থাক্ না।

থাক্। কত আছে না আছে সন্ধ্যা জানে না। আছে কি না আছে তাও ঠিক বলতে পারে না। কিন্তু ছোড়দাকে টাকার কথা বলতেই হবে। ঠিক দু-হাজার নয়, আর কিছু বেশী টাকার কথা সে বলবে—সংসারের জন্যে তার নিজের দরকার। চাকর মাইনে পায় নি অনেক দিন। বাড়ি ভাড়াও দেওয়া হয় নি। এমন করে আর চালানো যায় না। একটা ব্যবস্থা করতে হবে বইকি। রমেন না করতে পারলে সন্ধ্যাকেই করতে হবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে সব কিছু মিলিয়ে হঠাৎ লজ্জা অনেক কমে যায় যেন সন্ধ্যার। আর রমেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু সিগারেট খায়। হয় তো এখনও ঠিক বুঝতে পারে না যে সন্ধ্যা তার ছোড়দার কাছ থেকে দু হাজার টাকা চেয়ে আনবে কি-না।

একজন লোক এসেছিল সকাল বেলা। কড়া নাড়তে নাড়তে রমেনের

নাম ধরে ডাকছিল বারবার। অদ্ভুত অস্বাভাবিক গলার স্বর। সন্ধ্যা চমকে উঠেছিল প্রথমটায়। রমেন কিন্তু একবার মাথা তুলেছিল। তারপর আবার মন দিল কাগজ পড়ায়। চাকর বাজারে গেছে তখন।

কে ডাকছে যে অনেকক্ষণ থেকে। একটা কিছু বল—

উত্তেজিত চোখ রমেনের। কপালটা কুঁচকে গেছে। মুখ জোড়া বিরক্তি নিয়ে সে বলে, আপিসে না গিয়ে লোকটা কেন যে বাড়িতে এল—ওকে বলে দাও যে আমি বাড়ি নেই।

আমি ? ঘাবড়ে গিয়ে সন্ধ্যা বলে, আমি কি কারুর সামনে যাই ?

সামনে যেতে হবে না। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে দাও—না হলে ঘ্যানর-ঘ্যানর করে আমাকে এক ঘণ্টা জ্বালাবে।

সন্ধ্যা নড়ে না। বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। রমেনের আর একটু কাছে সরে এসে ফিসফিস করে ওঠে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ? না না। তুমি একটু যাওনা বাইরে—

তোমাকে নিয়ে আমি কি করি বল তো ? একেবারে একটা—কোন বিশেষণ হঠাৎ মনে করতে না পেরে খট করে দরজার খিল খুলে লোকটার সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রমেন জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার ?

ভদ্রতার সব আবরণ খসিয়ে লোকটা চিৎকার করে ওঠে, আপনার কি ব্যাপার তাই বলুন ? অতগুলো পার্টির কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসেছেন—কোথাও কোন সাপ্লাই যায় নি। আপনি স্রেফ উধাও। এখন অত টাকার দায় নিয়ে আমি কি করি বলুন তো ? কড়া স্বরে রমেন বলে, আমি তার কি জানি? আপনার লোককে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে আমি তো চলে এলাম। আর এখন আমি নতুন ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত—

কিন্তু অ্যাডভান্সের কথা আপনি তো একবারও বলেন নি ?

দরকার মনে করি নি, ঘড়ি দেখে রমেন, আচ্ছা, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

আচ্ছা, চিৎকার করে ওঠে লোকটা, আপনাকে আমি দেখে নেব। জেল খাটিয়ে তবে ছাড়ব। টাকা ফেরত দেবেন কি-না ?

দেখুন মশাই, কোমরে একটা হাত রেখে রমেন বলে, যা পারেন করুন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে আমি মানহানির মামলা আনব বলে দিলাম—

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার দৌড় আমার খুব ভাল করে জানা আছে, দৃষ্টিতে আগুন ছিটিয়ে লোকটা বলে, সাতদিন সময় দিয়ে গেলাম। তার মধ্যে টাকা ফেরত না পেলে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল।

রমেন হঠাৎ যেন সন্ধ্যার চোখের সামনে রহস্যের একটা ভারী পর্দা ঝুলিয়ে দেয়। সেটা কাঁপে। কঠিন ঝাপটায় তার বুকের ভেতরটাও কাঁপিয়ে দেয়। সে প্রবল একটা ধাক্কা খায়। বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রমেনের দিকে। একটা কথাও জিজ্ঞেস করতে পারে না।

রমেন একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরে আসে। শুকনো মুখ। কেউ কোথাও নেই। ঘর অন্ধকার। চাকর বলে, সন্ধ্যা নাকি একটু আগে কোথায় বেরিয়েছে। বিস্ময়ের রেখা ফোটে রমেনের মুখে। খোঁজ নিয়ে জানে, আর কেউ আসে নি। একাই বেরিয়েছে সন্ধ্যা। আলো জ্বালায় না রমেন। অন্ধকারেই বসে থাকে চুপচাপ।

ফিরে এসে আলো জ্বেলে সন্ধ্যা চমকে ওঠে, তুমি! কখন এলে?

এই তো, হাসে রমেন, যাক একা-একা বেরুতে পারলে শেষ অবধি! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি নি—

লতিকাদের বাড়ি গিয়েছিলাম—

যেখানেই যাও, বেরুতে পারলেই হল, রমেন উঠে দাঁড়ায়।

একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম লতিকার কাছে, রমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বলে, ওদের ইস্কুলে নার্শারী দু-একদিনের মধ্যে খোলা হচ্ছে কি-না—

তুমি—তুমি চাকরি করবে? কথাটা যেন রমেন বিশ্বাস করতে পারে না।

হ্যাঁ আমি, উগ্র ঝাঁজে কঠিন হয়ে উঠে সন্ধ্যার স্বর।

জোরে-জোরে হাসে রমেন, একটা চোরের স্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে লজ্জা করবে না তোমার?

না, মাথা তুলে সন্ধ্যা বলে, লজ্জা করত যদি না তুমি এক পা বাড়িয়ে রাখতে জেলের দরজায়। এবার থেকে আমার সব লজ্জা শুধু তোমার কাছে আর তোমার জন্যেই।

রমেন আবার বসে পড়ে চেয়ারে। হাসতে গিয়ে মুখটা অদ্ভুত দেখায় ওর। লজ্জা পেলে সন্ধ্যাকে যেমন দেখায় ঠিক তেমন।

৩১শে আগস্ট : ১৯৫৯

সোমবার সকাল : কলিকাতা

॥ সোনা রুপো খাদ ॥

এখন না। আর একদিন। যখন ধৈর্যের হিমালয়-বাঁধ ভেঙে যাবে বন্দনার। তখন। তখন জিবের বারকয়েক ওঠা-নামায় এক মুহূর্তে মুখের একটি কথায় লোকটার চেহারা একেবারে অন্যরকম করে দিতে পারে বন্দনা। তার আর একটুকুও লজ্জা করবে না।

কি করবে অখিল তখন? স্থিরবিদ্যুতের মত দাঁড়িয়ে থাকবে বন্দনা। আর বৈদ্যুতিক তীব্র আঘাতে হয়তো অখিলকে দেখাবে একটা শিলীভূত ভয়ঙ্কর কঙ্কালের মত। মূক। জড়। প্রথম কিছুক্ষণ কোন অভিব্যক্তি নেই শরীরের কোথাও। ঠাণ্ডা একটা ঢেউ আসবে ঘরে। বাইরে হিমের ভিজে-ভিজে ভারী আবরণ অনুভূতিকে দমকা একটা নাড়া দিয়ে যাবে।

তারপর? হয়তো অখিলের উন্মত্ত দেহ আছড়ে পড়বে নির্বিকার দেয়ালে কিংবা ক্ষিপ্ত আঙুলগুলো বন্দনার চেহারাটা বিকৃত করবার হিংস্র চেষ্টায় বীভৎস হয়ে উঠবে।

উঠুক। যা হয় হোক। একদিন অখিলকে সে বুঝিয়ে দেবে যে ফিনফিনে একটা রেশমী সুতোর ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দনার সামান্য একটা আঁচড়ে তা ছিঁড়ে যাবে।

হয়তো তাহলে আস্তে আস্তে তার চোখ থেকে লালসার উগ্র ঝাঁজ মুছে যাবে। তখন যদি সে আসল ভিতের সন্ধান পায়—যদি খুঁজে খুঁজে একটা সত্যিকার মানুষকে দেখতে পায় নিজের মধ্যে। আর তখন যদি একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় অন্য কোথাও।

হিমের একটানা হাওয়া ভারী পর্দা কাঁপিয়ে ঘরে আসছে। উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়ার উৎসাহ বন্দনার এখন নেই। পাশের

ঘর থেকে অখিলের কাটা-কাটা গলার স্বর ভেসে আসছে। গলানো সীসের মত। তার প্রত্যেকটি কথা শুনতে পাচ্ছে বন্দনা।

তা হয় না প্রভাতবাবু, রূঢ় গম্ভীর স্বর অখিলের।

আপনি ইচ্ছে করলেই হয়। আর মোটে একমাস আমি সময় চাইছি। তার মধ্যে যেমন করে হোক টাকা জোগাড় করব, ক্লান্তিতে লোকটা বুঝি ভেঙে পড়বে।

কিন্তু তাতে আমার লাভ কি বলুন ?

ফিসফিস করে লোকটা যেন অখিলকে আশ্বাস দেয়, সুদ—সুদ তো আমি আপনাকে ঠিকমত দিয়ে যাই।

সামান্য সুদের জন্যে আমি আপনার বিপদের সময় অতগুলো টাকা দিই নি। আপনি জানেন যে এটা আমার ব্যবসা।

জানি। কিন্তু লাভ-লোকসানের ওপরেও তো আর একটা কিছু আছে। ও বালাজোড়া আপনি দয়া করে আর একমাস রাখুন। যার অসুখের জন্যে ওটা আমি আপনার কাছে বন্ধক রেখেছিলাম, সে আর নেই। আমার স্ত্রী। তাকে আমি কথা দিয়েছিলাম ওটা ফিরিয়ে এনে দেবই।

তিনি যখন নেই, তখন একথা ভাবেন কেন ?

আমি তো আছি। নিজের কাছে আমি নিজে চোর হয়ে আছি।

আপনি লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক—

চেয়ার সরাবার কর্কশ একটা আওয়াজ ভেসে এল। বোধ হয় অখিল উঠে দাঁড়িয়েছে। লোকটাকে আর বেশি কথা বলবার অবসর দিতে চায় না।

বুকের ভেতরটা হু হু করে জ্বলছে বন্দনার। রিক্ত শূন্য ব্যর্থতার একটা নির্জীব প্রতিমূর্তি। এমনি করেই ছেলেটার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চায় অখিল। নগ্ন নৃশংস সঞ্চয়ে।

ঠিক দু বছরের মোটাসোটা ছেলে। ফোলা-ফোলা গাল। বন্দনার চোখ পড়ে একবার ওর দিকে। ঘুমে অচেতন। ঘুমের ঘোরেই হাসছে।

চোখ ফিরিয়ে নেয় বন্দনা। ও যেন একটা স্থির রুদ্ধ আক্রোশ। যেন ওর জন্যেই অখিলের এই উলঙ্গ অধঃপতন। তবু ওকে দিয়েই বন্দনা আজকের এই অখিলকে শেষ করে দেবে। আশ্চর্য অতর্কিত অস্ত্রোপচারের এক অভিনব কৌশলে। অখিল কল্পনাও করতে পারে না।

জুতোর খটখট আওয়াজ। জেলখানার প্রহরীর পায়ের শব্দের মত। বন্দনা হিম হয়ে যায়। সে জানে এখন অখিল এসে কি কথা বলবে। অহঙ্কারের বিকট আভায় জ্বলজ্বল করবে তার ঈর্ষাতুর মুখ। আরও কয়েক শ টাকার নির্মম এক সংবাদ।

ঘরে ঢুকে প্রথমে অখিল বন্দনাকে দেখে না। সে দেখে তার ঘুমন্ত একমাত্র ছেলেকে। গর্বিত পা ফেলে কটের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। মুখে অল্প অল্প হাসি। ঝুঁকে পড়ে চুমু খায়। ফোলা-ফোলা গালে আস্তে আস্তে হাত বুলোয়। তারপর ঘুরে দাঁড়ায়।

আজ চার শ টাকা লাভ হল। দিস বয় মাস্ট গো টু ইংল্যাণ্ড, দেশলাইয়ের ওপর টুকটুক করে সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে অখিল বলে, ভাবছি, সাত-আট বছর বয়স থেকেই ওকে বিলেতে রেখে লেখাপড়া শেখাব—কি বল ?

ঠাণ্ডা স্বরে বন্দনা বলে, আমি কিছু জানি না। এসব কথা তুমি আমাকে বল না। আমি শুনতে চাই না।

হাসতে হাসতে অখিল বন্দনার কাছে এগিয়ে আসে। তার একটা হাত আস্তে ঝাঁকিয়ে দেয়। তারপর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, আশ্চর্য ! কোন সমর্থন নেই। কখনও তুমি আমার প্রশংসা কর না বন্দনা। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে টিপে টিপে হাসে অখিল। অচেনা ক্রূর একটা জানোয়ারের মত।

কাঁসার মত খনখনে আওয়াজ বার হয় বন্দনার গলা চিরে, কিসের প্রশংসা তুমি আমার কাছে আশা কর ?

বাঃ, ঝিরঝিরে পাতার মত অখিলের স্বর, যে স্বামী বেশি উপার্জন করে সব স্ত্রীই তো তার সাজ্ঘাতিক রকম প্রশংসা করে।

তাই নাকি? এখনও তুমি এমন আয়ের গর্ব কর?

কেন করব না? আমি তো চুরি করি না বন্দনা। শহরের বহু লোক তো এটা করে। এ তো ব্যবসা—

হ্যাঁ, দিনের আলোয় তুমি পা দিয়ে লোকের গলা চেপে ধর। ছিঃ! কিন্তু এসব তুমি কর কার জন্যে?

স্ত্রী। পুত্র। রসিকতা করে চোখ বন্ধ করে অখিল, সমাজে যেটা চালু, সেটা অস্বীকার করবার মানে হল বোকামী—মূর্খের আদর্শবাদ। আর আমি তো সমাজ-সংস্কারক গোছের কিছুই নই। সাধারণ আফিসের সামান্য এক চাকুরে—

গায়ের হালকা চাদরটা ছুঁড়ে ফেলে বন্দনা বলে, কিন্তু সমাজের চালু নিয়ম অস্বীকার করে আমি কি তোমাকে বিয়ে করি নি?

নিশ্চয়ই, বেশ জোরেই হাসে অখিল, সেটাই তো আমার অহঙ্কার। আমি জানি, তুমি সিংহাসন ছেড়ে আমার পর্ণকুটিরে এসেছ। তাই আমি সব সময় সতর্ক।

কিন্তু সুদখোরের সিংহাসনে—

বাধা দিয়ে অখিল বলে, এ পৃথিবীতে সর্বত্রই সুদের কারবার বন্দনা। আসল আর সুদ। সুদ আর আসল। তুমি আসল। খোকা সুদ। আমি আসল। আমার উপার্জন সুদ। একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার কর—সব গোলমাল মিটে যাবে।

না, অখিলের দৈনন্দিন জীবনধারার বিরুদ্ধে হিংস্র জীবন্ত প্রতিবাদের মত বন্দনা রুখে দাঁড়ায়, আমি জীবনে কোনদিন কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে পারি নি—লোক ঠকাবার এই ভয়ঙ্কর ব্যবসা তুমি বন্ধ কর, বন্দনার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়, না হলে আমি তোমার সব দম্ভ এক মুহূর্তে ভেঙে দেব—

তখনও হাসে অখিল, অকারণে উত্তেজিত হয়ো না বন্দনা। খোকা

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলেমানুষী আপনিই একদিন কেটে যাবে, সিগারেটের এলোমেলো ধোঁয়া একটা রুপালী আমেজ ফোটায় অখিলের মুখের আশেপাশে। মাকড়সার জালের মত। হাত ঝাকিয়ে সে ধোঁয়া ঠেলে-ঠেলে দেয়। একটু থেমে আবার বলে, ঘরে বসে সময় কাটাও, বাইরের জগতের কোন খবর রাখ না। সব কিছুর দাম হু হু করে বাড়ছে। মনে কর, আমি যা মাইনে পাই—অর্থাৎ দুশো পঁচাত্তর টাকা—যদি ঠিক ওই টাকাটা মাসে মাসে সংসার-খরচের জন্যে তোমার হাতে তুলে দিতাম—তাহলে ?

একটা ঠাণ্ডা পাথরের মুর্তি যেন যন্ত্রের সাহায্যে কথা বলে, তাহলে আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম।

হা-হা করে হাসে অখিল, না, পারতে না। অভিযোগের বড় বড় ঢেউ সারাদিন তোমাকে দিশেহারা করে তুলতো। খোকা কষ্ট পেত। আমার মুখে হাসি থাকত না।

আমি তোমাকে বলছি তুমি এ ব্যবসা বন্ধ কর। না হলে আমি —বন্দনা প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে।

অখিল হেসে জিজ্ঞেস করে, মরবে ?

না। তোমাকে মারব।

খুন ?

তার চেয়েও বেশি। তোমার অবস্থা জেনেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। যদি জানতাম যে তুমি এমন করে—

তাহলে কি ব্রজেনকে বিয়ে করতে ?

না। তবে তোমাকেও যে করতাম না, সে কথা ঠিক। কেন তুমি এমন হলে ?

আর একটু বয়স হলেই বুঝতে পারবে।

ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে ওঠে। তাকে কোলে তুলে নেয় অখিল। আদর করে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, তোকে আমি রাজা করতে চাই বলে তোর মা আমাকে বকে। ভালবাসে না। তুই বড়

হয়ে মাকে খুব বকে দিস—য়্যাঁ! খোকাকে কাঁধের ওপর ফেলে অখিল তাকে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়ায়।

বন্দনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে ছেলেকে আর স্বামীকে অনেকক্ষণ। কথা বলে না। কঠিন শরীরটা আছড়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে ফেলতে চায়। কিন্তু না, জ্ঞান হারিয়ে লাভ নেই। এখনও সময় আছে। সেই বল্গায় একটা হিংস্র টান দিতে পারলেই হঠাৎ-বাধা-পাওয়া ঘোড়ার মত হাঁ হাঁ করে গতিরুদ্ধ হবে অখিলের। মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে। ফুঁসবে। গজরাবে। কিংবা মরে পড়ে যাবে। আজই কি তার সেই অস্ত্র ছাড়বে বন্দনা? তার সযত্নে গোপন করা লজ্জার অঙ্গার ছুঁড়ে মারবে অখিলের হাসি-হাসি মুখে? প্রতিক্রিয়ার জন্য এখন পুরোপুরি প্রস্তুত বন্দনা। সে ভেঙে পড়ে চেয়ারে। আলতো হাত ত্রুটো ছড়িয়ে দেয়।

ঠাণ্ডা দেয়াল। হিম-হিম নিশ্বাসের শব্দ। খোকা চুপ করেছে। আস্তে আস্তে তাকে আবার কটে শুইয়ে দেয় অখিল। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। অদ্ভুত হাসির একটা শীর্ণ রেখা কেঁপে ওঠে বন্দনার শুকনো ঠোঁটে।

হাসির একটা অর্থ আছে। এখন বন্দনা একাই শুধু সেটা বুঝতে পারে। অখিলও বুঝবে। আজ কিংবা কাল। বুঝবেই। সে মরবে। কিন্তু খোকা বাঁচবে। আর বন্দনা? দেখা যাক। সে পিছিয়ে যায় বছর তিনেক আগে। অদ্ভুত একটা সমর্পণ। ব্যবসায়ী মঞ্চের সাধারণ নাটকের মত।

ত্রুপাশে ত্রুটো মুখ। মাঝখানে হলদে রঙের খাঁজ-কাটা দামী একটা ফুলদানি। সোজা সোজা অসংখ্য রজনীগন্ধা। তাজা। সদ্য-ফোটা। স্থির কিন্তু চঞ্চল গন্ধের কৃপণতা নেই। সবুজ ডাঁটায় ঠাসা ফুলদানি। বোধ হয় আর একটুও ফাঁক নেই কোথাও। ফুলদানিতে কতটা জল মুখ বাড়িয়ে বোঝা যায় না।

টেবিলের চাদরটাও হলদে। কিন্তু ঘরের আলো ঈষৎ নীলাভ। বন্দনার পাতলা সিল্কের শাড়ির রঙের মত। আর একটা সাদা পাথরের ছাইদান। অখিলের সাধারণ হওয়াইয়ান সার্টের রঙের মত।

দুপাশে দুজন। বন্দনা আর অখিল। একজনের কথা এইমাত্র শেষ হয়েছে। আর একজন আনন্দের জোয়ারে ঘন ঘন সিগারেট ঠোঁটের কাছে তুলছে আর নামাচ্ছে। একটু যেন বিমূঢ়। বিচলিতও।

খুশির একটা হঠাৎ অস্বস্তি অখিলকে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না। ও উঠে দাঁড়ায়। শেষ-হয়ে-যাওয়া জ্বলন্ত সিগারেট থরথর আঙুলে টিপে টিপে ছাইদানে নেবায়। উত্তরে বন্দনাকে কিছু একটা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।

বন্দনা ওঠে না। হাত বাড়িয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজে রজনীগন্ধার মতই শরীরটাকে টান-টান করে নেয়। অখিলের মুখের দিকে তাকায়। ওর মুখ যেন একটা চঞ্চল বিস্ময়। আর বন্দনা নিজে যেন ফুলের মত স্থির সমর্পণ। খুশি আর অহঙ্কার। আত্মবিশ্বাস আর শপথ। দুজনের প্রতিদিনের একক জীবনের। রজনীগন্ধার ঝাড় যেন ওদেরই গন্ধ-আকুল অলৌকিক ফুলদানিতে ধরা ঘন শুভ্র জমাট ভবিষ্যৎ।

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও হাসতে পারে না অখিল। মনে উত্তাল ঢেউয়ের প্রবল ঝাপটা অনুভব করলেও হাসি দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারে না। তাই পাওয়ার অহঙ্কারের কাঁপা-কাঁপা আভা ফুটে ওঠে ওর অসহায় চেহারায়। হয়তো কিছু নেই বলেই। সব দিক থেকে অখিলের সঞ্চয়ের অঙ্কটা এখনও শূন্যই থেকে গেছে।

তবু আজ বন্দনাকে কিছু একটা বলতে হবে। হবেই। আজ— এই মুহূর্ত থেকে হেমন্তের ঠাণ্ডা নিবে-আসা আলোর ইতস্ততঃ ছড়ানো কণা কণা রশ্মি থেকে ও কথা সংগ্রহ করবে। করবেই।

অখিল বলে, কি দেখলে তুমি আমার মধ্যে ?

বন্দনা হাসে, একটা বেপরোয়া শপথ। বিষ নামানোর অদ্ভুত এক ক্ষমতা। হয়তো তুমি নিজেও তা জান না।

না। যারা হোটেলে গিয়ে মদ খেয়ে নাচে আর চুরির পয়সায় দামী দামী গাড়ি চড়ে—যারা সুড়ঙ্গপথের পথিক, আমি শুধু তাদের ঘৃণা করতে জানি। চাবুক মারতেও। তাই বোধ হয় আমি শহরের সবচেয়ে দীনতম মানুষ। আর তাই আমার শ্রদ্ধা—আমার সব কিছু শুধু তোমার জন্যেই।

কিন্তু ব্রজেন? গলার স্বর যেন ভিজে ওঠে অখিলের।

সেই তো আমার চোখ খুলে দিয়েছে অখিল। ও একটা স্থূল দাম্ভিক, বড় কর্কশ ভাষা বন্দনার, তার দম্ভ বিদ্যার নয়। বুদ্ধির নয়। রূপেরও নয়। তার দম্ভ ঐশ্বর্যের। টাকা আমি যে অনেক দেখেছি। হ্যাঁ, নিরীহ মানুষকে ঠকিয়ে রোজগার করা টাকা। বাপ-ঠাকুর্দার সেই চলতি রীতিটাকে পাল্টে দেব বলেই তো তোমাকে—

তবু আর একটু ভেবে দেখ, উত্তেজনার জোয়ারে দিশেহারা অখিল থেমে থেমে বলে, একটা বাজে আপিসে চাকরি করি। আমার কেউ নেই। কিছু নেই।

দূর-থেকে-শোনা পাহাড়ী ঝরনার মত কলকল করে ওঠে বন্দনা, কিন্তু যা আছে তা শুধু আমি একাই দেখতে পেয়েছি। শুধু তার ওপর ভরসা করেই বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত মনের জোরও আমার এসে গেছে। তুমি তো জান বাঁধা নিয়মের ছক উল্টে দিচ্ছি বলে এ বিয়েতে তাঁদের অমত হবে।

জানি, ব্যাপক ভয়ের ছায়া নামে অখিলের চোখে-মুখে, কিন্তু তোমাকে আমি রাখব কোথায়?

তুমি যেখানে আছ সেখানে, একটু জোর দিয়ে কথা বলে বন্দনা, ঠিক সেখানে তুমি থাকবে, ও একটু থামে, আমিও থাকব।

ভয়ে ভয়ে অখিল বলে, তোমাকে আমি সুখে রাখব বন্দনা।

আমি জানি।

ভেবে ভেবে অখিল বলে, টাকাও করব।

হঠাৎ আঘাত পায় বন্দনা। ম্লান দৃষ্টিতে অখিলকে দেখতে দেখতে বলে, কিন্তু টাকা-টাকা করে ব্রজেনের মত তুমি অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেয়ো না। তুমি দম্ভের বিষ, বঞ্চনার বিষ, চিরকালের যৌবন দিয়ে গুঁড়িয়ে দাও। আমি তোমার কাছে শুধু সেইটুকুই চাই। টাকা না।

অখিল বন্দনার কাছে আসে। শক্ত করে তার একটা হাত চেপে ধরে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে। না-জানা শরীর-দোলান মিঠে-কড়া একটা আমেজের স্বাদ পায় মনের মধ্যে। কথা বলে না। কাঁপে। আর চোখের পাতা না ফেলে দেখে বন্দনাকে। যখন বাইরে অল্প অল্প অন্ধকার হয়ে আসে আর একটি একটি করে তারা ফুটে ওঠে আকাশে, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক উষ্ণ মনে হয়—তখনও। সে ঘরে অনেকক্ষণ আলো জ্বলে না। দরকারও হয় না।

একঘর আত্মীয়-আত্মীয়ার অনুনয় বিদ্রূপ শাসন তুচ্ছ করে বন্দনা। মেরুদণ্ড সোজা করে নির্জন সহজ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সত্যি একদিন অখিলের সংসার ভরে তোলে।

কিন্তু খুশির কোন বিদ্যুৎ-ছটা নেই অখিলের মুখে। ঠাণ্ডা নির্বাক একটা মানুষ। ভীত। শঙ্কিত। বন্দনা যেন ওর সারা দিনরাতের জীবন্ত এক ভয়। জোরে হাসতে পারে না অখিল। বন্দনাকে স্পর্শ করতেও ইতস্তত করে। একজন অনেক উঁচুতে। আর একজন অনেক নিচুতে। মাঝখানে নড়বড়ে এক সেতু। সেটা ভাঙবার জন্যে ছটফট করে অখিল। আপন মনেই।

আর কোথা থেকে একটা রোমাঞ্চকর ঝিমঝিমানি আসে বন্দনার শরীরে। কখনও কখনও বিবর্ণ মুখ। বিষণ্ণ চোখ। ছটফটানির গোপন এক তাগিদ। আর নির্মম লজ্জার ঘনঘন শিহর। নিঃঝুম

দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এপাশে-ওপাশে তাকায়। নিজের সঙ্গে সংগ্রামের দুরন্ত এক ক্ষ্যাপামি। বুক চিরে চিরে কি একটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। লজ্জা। আগুন-লাগা ভয়ঙ্কর এক লজ্জা।

তখন অখিলকে খোঁজে বন্দনা। এপাশে ওপাশে। ঘরে বাইরে। উঠে দাঁড়ায়। পড়ে যায়। একেবারে একা। কেউ কোথাও নেই।

মনে মনে প্রস্তুত হয় বন্দনা। আগুন-লাগা গোপন লজ্জাকে হিঁচড়ে টেনে এনে তুলে ধরতে চায় অখিলের সামনে। সব যন্ত্রণার শেষ করে দিতে চায়। বিয়ের প্রথমদিকেই কেন এ লজ্জার যন্ত্রণা তাকে চমকে-চমকে দেবে। কেন আশঙ্কার একটা হিম-সরীসৃপ সারাদিন তার শরীর বেয়ে ঘুরে ফিরবে।

আজই সে মুক্ত হবে। ফিরে আসুক অখিল। একটুও ইতস্তত না করে সোজা কথাটা সহজভাবে তাকে জানিয়ে দেবে। কি আর হবে! অখিলের ঘর-কাঁপানো হাসির নির্ভীক আশ্বাসে বন্দনার সব লজ্জা ধুয়ে মুছে যাবে। তখন পাখি-ডাকা ভোরের চিকচিক আকাশের মত তুষারশুভ্র মনে হবে চারপাশ।

কিন্তু অখিল আসবার আগেই শহরকে সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধোঁয়াটে হিম-সন্ধ্যা নামে। বন্দনার গোপন লজ্জার মত। আর তার কুঁকড়ে-যাওয়া শরীরটা তখন নির্জন এক কোণে লজ্জার বোঝা নিয়ে লুকিয়ে থাকতে চায়।

জায়গা নেই। কোথাও একটুও জায়গা নেই। বন্দনার লজ্জা তাকে আলো জ্বালাতেও দেয় না অনেকক্ষণ। অন্ধকার তাকে ঢেকে রাখুক—লুকিয়ে রাখুক—যতক্ষণ পারে ততক্ষণ।

ভীত জানোয়ারের পায়ের শব্দের মত খসখস শব্দ। বুক-কাঁপানো একটা চমক। বন্দনা দেখতে পেয়েছে অখিলকে। সে মুখ তোলে। আবার নামিয়ে নেয়। প্রেতচ্ছায়ার মত অখিল এগিয়ে আসে। দমে-যাওয়া একটা মানুষ। জুড়িয়ে যাওয়া একটা জীবন। সুইচ হাতড়ে-হাতড়ে আলো জ্বালে অখিল।

এস, বন্দনার গলা শুকিয়ে যায়। যন্ত্রণার পুরু একটা ছায়া নামে মুখে। অখিল দেখে ভয় পায় কিনা কে জানে।

অখিল কিন্তু ভয় পায় বন্দনাকে দেখে। অভাবের নিষ্করুণ কম্পমান ভয়। জোরালো আলোর নীচে সে দেখে শীর্ণ কঠিন একটা মূর্তি। জৌলুস নেই। ছোট ঘরে বেমানান বোবা নির্দয় প্রতিবাদ।

অখিল দেখতে পারে না বন্দনাকে। চোখ নামায়। নিদারুণ এক লজ্জা তাকেও কঠিন করে তোলে। প্রসারিত মনটা গুটিয়ে আসে। প্রত্যেকটি জিনিস এক অলৌকিক কৌশলে বদলে ফেলতে চায়। নিজেকে। এই ঘরকে। সেগুন কাঠের চেয়ারগুলোকে। পুরনো পর্দা আর এই দীন পরিবেশকে। তাহলে আবার বন্দনার শরীর আর মুখ প্রথম দেখার মত জ্বলজ্বল করবে। হাসির দমকে গাছের পাতারাও যেন নড়ে উঠবে। চোখ দুটো তারা হয়ে ফুটে উঠবে।

তুমি আমাকে কিছু দিন সময় দাও বন্দনা।

চমকে উঠে বন্দনা বলে, কিসের সময় ?

সব কিছু পরিবর্তন করবার, ঠাণ্ডা কঠিন মেঝের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি একটা শপথ মনে মনে গ্রহণ করে অখিল, আমি তোমাকে এই লজ্জা থেকে মুক্তি দেব—দেবই।

বন্দনার চোখের তারা দুটো হঠাৎ যেন ছোট হয়ে যায়। আকণ্ঠ ভয়ঙ্কর তৃষ্ণায় জিব শুকিয়ে যায়। চেয়ারের একটা হাতল সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরে যেন শেষবারের মত কথা বলে, মুক্তি ? কিসের মুক্তি ?

এ অভাব আর থাকবে না, পা দিয়ে আস্তে শব্দ করে অখিল, আমি অন্য পরিবেশ সৃষ্টি করব। বিয়ের আগে তুমি যেমন ছিলে, আমি তোমাকে ঠিক তেমনি করেই রাখবার চেষ্টা করব।

অখিলের কথার তোড়ে বন্দনার সব ভয় আর আশঙ্কা হঠাৎ মুছে যায়। ও হাসে। মাথা তুলে একবার ওপরে তাকায়। অখিল

জানে না। ও কিছু বোঝে নি। ভুল বুঝেছে। কিন্তু এখন কি ভুল ভাঙবার সময়?

না। কেন নয়? মনের মধ্যে শক্তি খুঁজে পাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে বন্দনা। কিন্তু অজস্র তুষারকণার মত সঙ্কোচের ভীরু ঝাপটা তাকে নির্বাক করে তোলে। তার হাত আস্তে আস্তে শ্লথ হয়ে আসে।

বন্দনা দেখে অখিলকে। বলতে পারে না। বোঝাতে পারে না। মূক হয়ে থাকে অনেকক্ষণ। অকাল বর্ষণে বিব্রত গাছের ডালে বসে থাকা ছোট একটা পাখির মত।

তারপর সে হাসে। আর তার নিশ্চিন্ত হাসির আওয়াজ কেমন অদ্ভুত মনে হয় অখিলের। হাসতে হাসতেই বন্দনা বলে, তোমার সঙ্গে আমার কি শর্ত ছিল?

কিছু না বুঝে অখিল বলে, সুখে রাখবার।

তা কি রাখ নি? কাঠের চেয়ারের হাতলে যেন গলে পড়ে বন্দনা। ঠাণ্ডা ধোঁয়া-ওঠা বরফের তালের মত।

না, মাটির দিকেই তাকিয়ে থাকে অখিল, টাকা না থাকলে সুখ হয় না। লজ্জা রাখবার জায়গাও থাকে না। যারা আসে, তোমাকে এখানে এভাবে দেখে—তারা কি ভাবে আমাকে?

হাসি নিবে যায় বন্দনার। অখিলের কথার তীব্র কটু একটা স্বাদ তাকে বারবার খোঁচা দেয়। অধঃপতনের রূঢ় ইঙ্গিতে অখিল যেন হাঁসফাঁস করে। তার মনের এদিকটা সে আগে কোনদিনও দেখতে পায় নি বলেই এখানে এসেছে। সব ছেড়ে। সকলকে ছেড়ে। ব্রজেনের স্থূল দম্ভ দুই পায়ে মাড়িয়ে। ঠোঁটদুটো যন্ত্রণায় শুকিয়ে ওঠে বন্দনার।

তুমি কি চাও? ও থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করে।

তোমাকে সুখী করতে আর নিজে সুখে থাকতে চাই।

দু এক মিনিট চুপ করে থাকে বন্দনা। না, সে অখিল নয়। তার

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে একজন সাধারণ মানুষ। অলীক জীবনের সঙ্গে আপোষ করে সে নিজেকে সমর্পণ করে। ক্লীবের মত বেঁচে থাকে। কিন্তু পশুর মত মরে যায়। অখিল মরে যাবে। মরবার আগ্রহে সে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ঠাণ্ডা স্বরে বন্দনা বলে, নিজেকে মের না। একপাল মৃত মানুষের মধ্যে একমাত্র তোমাকে জীবন্ত দেখেছিলাম বলে—

আমি মূর্খ ছিলাম বন্দনা। ছেলেমানুষীর বিপুল তোড়ে শুধু তৃণের মত ভেসে চলেছিলাম। তাই একরাশ অপচয় করে এসেছি এতদিন। কিন্তু তুমি আমাকে তীর দেখিয়েছ। আমি তোমাকেই আঁকড়ে ধরব। দুজনের জীবনেই রঙ লাগুক। ঝলসাক।

অখিলের ভাষাতেই বন্দনা বলে, রঙ! এখনও কি লাগে নি?

মনে লাগলেও, বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই।

নাই বা থাকল।

নিজের অক্ষমতার ঢাক পেটাব কেমন করে? সংসার যখন বড় হবে, তখন চলবে কেমন করে? স্বামীত্বের যোগ্যতা এখন কি আছে আমার?

আছে বলেই তো মর্যাদা দিয়েছি।

তোমার বাড়ির কেউ তো দেয় নি।

দেবে না বলেই তো আমি দিয়েছি। তাদের কাছ থেকে তুমি মর্যাদা আশাই বা কর কেন?

আশা হয়তো করি না, এদিক-ওদিক তাকায় অখিল, কিন্তু নিজের যোগ্যতার একটা প্রমাণ প্রত্যেককেই দেখাতে চাই।

কিসের যোগ্যতা? নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করবার মত কাপুরুষ তুমি কবে থেকে হলে?

এতক্ষণ পরে হাসে অখিল, তোমাকে পাবার পর থেকে।

অখিল লক্ষ্য করে না যে বন্দনার সারা মুখ ভরে ভারী মেঘ নামে! তামাটে রাশিরাশি মেঘ। তখন তার মন থেকে গোপন সেই লজ্জার

যন্ত্রণা হঠাৎ মুছে যায়। আর এক নতুন যন্ত্রণা *পাঁজরে-পাঁজরে অস্বস্তি* জাগায় অখিলকে উপলক্ষ্য করে।

একটা সতেজ সহজ প্রাণকে যেন মেরে ফেলছে বন্দনার সংসার। বন্ধনের মাধুর্যের ফাঁকে ফাঁকে যেন তীব্র বিষের ঝাঁজ লুকিয়ে থাকে। নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরের ভেতরে যায় আর তিলে তিলে মনকে মারে। বিরাট একটা ফাঁকি যেন বন্দনা একাই বুঝতে পারে। আর মনে মনে মরে যায়।

তখন রাত বেশি নয়। কিন্তু চারপাশ একেবারে চুপচাপ। সমস্ত পৃথিবী যেন একটা স্থির প্রতীক্ষার মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দনা উঠে দাঁড়ায়।

ঠিক সেই মুহূর্তে অখিলকে দেখতে ইচ্ছে করে না ওর। কথা বলতেও চায় না। হঠাৎ বিকট উল্লাস অনুভব করে মনের মধ্যে। হাসির উত্তাল তোড়ে ফেটে পড়তে চায়। বিপুল একটা চমৎকার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ুক অখিল।

কিন্তু হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না বন্দনা। অখিলের হাহাকারের ধরনটা নিজেই কল্পনা করে নেয়।

সে আর নেই। যাকে রজনীগন্ধা-ঠাসা হলদে ফুলদানির ওপাশে প্রথম হেমন্তের শিহরণ-আনা অপরাহ্ণে জীবন্ত চোখে বন্দনা দেখেছিল একদিন—সেই বেপরোয়া মুখ—যৌবন-প্রখর এক দীপ্ত শপথ—আজ বন্ধনের কড়া বিষে উধাও। দীপ্তির বদলে লালসা, পৃথিবীর বদলে ঘর আর প্রান্তরের সবুজ রঙের বদলে শুধু কলুষিত সঞ্চয় আজ অখিলের সম্বল। তার স্বপ্ন।

ভুল হয়তো হয় নি বন্দনার। এটাই আজকের অমোঘ নিয়ম। যতদিন সুযোগ আসে না ততদিন একরকম। আর সুযোগ এলেই সব কিছুর রাতারাতি পরিবর্তন। চরিত্রেরও! বিশেষ করে অখিল যে সমাজের লোক সেই সমাজের মানুষের।

বিপুল একটা রশ্মি এনে দিতে চেয়েছিল বন্দনা অখিলের জীবনে। সুরের মত আশ্চর্য এক অগ্নিসংযোগ। ইন্ধনের মত ছায়া হয়ে ফিরতে চেয়েছিল তার অগ্নিময় অঙ্গীকারে। কিন্তু সব ছাই হয়ে গেছে। বন্দনার অজ্ঞাতে তার বন্ধন অখিলকে শেষ করে দিয়েছে। এখন তার জন্যে শুধু সারা দিনরাতের মুহুর্মুহু হাহাকার। সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অখিল গিয়ে উঠবে তার বাপ-ঠাকুর্দার মত উন্নতির চরম শিখরে। তলার নিদারুণ অন্ধকারে আলোর পাতলা রেখার সন্ধানে বন্দনা ছটফট করবে যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন। অখিল তার দুঃখ বুঝবে না—গ্লানি ঘুচিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই সে করবে না—সে-বিষয়ে বন্দনার আজ আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রেমে একটা ঝলমলে ফাঁকি। স্নেহে একটা লোভনীয় কার্পণ্য। সব ছাড়িয়ে একটা যুগোপযোগী বণিক মন। অখিলকে এমন করে চায় নি বন্দনা। পবিত্র অনুষ্ঠানের পেছনে, সানাইয়ের সুর আর চন্দনের ঠাণ্ডা ফোঁটায় মৃত্যুর হিম-ইঙ্গিত কখন সব আচ্ছন্ন করে দেয়—সে-কথা কে জানত। অগ্নিসাক্ষী করে একজনেরই ভার নেয় আগ্রহ-উন্মুখ বর। স্বার্থপরতার ঝকমকে টোপর মাথায় দেয়। আর বোধ হয় সেই পবিত্র আগুনের মধুর আঁচে তিলতিল করে ব্যাপক বিদ্রোহী মনটাও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্ত্রী আর সন্তান। সংসার আর সংসার। হিংস্র। স্বার্থপর। কঠিন। নির্দয়। আলোর প্রলেপ দেওয়া ভয়ঙ্কর পবিত্র বন্ধন। বন্দনা ভয় পেয়ে যায়।

এ বাড়ি ছেড়ে বড় একটা বাড়ি নেব। শিগগিরই জমি কিনে ফেলব কয়েক কাঠা আর মস্তবড় একটা গাড়ি—বন্ধনের হিংস্র আগুন অখিলের শরীর ঘিরে লিকলিক করে।

কিন্তু কাদের টাকায়?

আবার কাদের? একেবারে নিজের টাকা। তুমি বোধ হয় কোনদিনও ভাব নি যে এত টাকা আমি জমাতে পারব?

মাথা না তুলে বন্দনা বলে, না।

আর কিছুদিন যাক, ঘনঘন সিগারেটে টান দেয় অখিল, দেখা যাক তোমার মা-বাবা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন কিনা, সহানুভূতিহীন নিষ্ঠুর শপথের মত তার কথাগুলো যেন বীভৎস রূপ নিয়ে ঘোরাঘুরি করে বন্দনার চোখের সামনে। আর নিষ্প্রভ হয়ে আসে তার দুই চোখ।

থেমে থেমে বন্দনা বলে, তুমি আমাকে আর খোকাকে অনেক দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পার?

কেন?

তোমার সংসারে আমি থাকতে চাই না। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস নেই। শ্রদ্ধা নেই। কিছু নেই।

হেসে হেসে অখিল বলে, কোথায় পালাবে?

পালাব না প্রতিবাদের মত সরে যাব।

তাহলে একটা বিকট দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তোমার, একটু থেমে অখিল বলে, আমার জীবনে আগে যেমন ছিল—

কিন্তু আমি না থাকলেও কি তুমি আবার আগের মত হতে পারবে না?

সে-বয়স কোথায় বন্দনা?

কিন্তু আমি আর খোকা—তুজনেই যদি না থাকি তাহলে এমন করে টাকা করবার ইচ্ছেটাও কি তোমার যাবে না?

জোরে হেসে অখিল বলে, সন্ন্যাসে আমার বিশ্বাস নেই।

বন্দনা আবার ফিসফিস করে উঠে, আমি আর তোমার নই। খোকাও তোমার থাকবে না—তাহলে কাদের জন্য তোমার এই জঘন্য সঞ্চয়—

নিপুণ অভিনেতার মত অখিল বলে, তোমরা আবার নতুন করে আমার হবে বলে। টাকায় কি না হয় বন্দনা?

সেই এক কথা। বিষাক্ত সাঁওতালী তীরের মত। নিছক স্নেহ নয়। নিছক প্রেম নয়। মাঝখানে অর্থের মানদণ্ড। খোকার জন্মে

বিরাট ব্যয়ের খসড়া সারাদিন মনে মনে হিসাব করে অখিল। যা তার প্রাণের টানে অনেক ছাড়িয়ে যায়। দেখতে দেখতে বন্দনার চোখের সামনে খোকা হয়ে উঠবে আর এক অখিল। তাহলে কি লাভ হল তার! খোকার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেকটি দিন হীরকখণ্ডের মত নির্ভীক প্রতিবাদ দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলবে বলেই তো বন্দনা ব্রজেনকে ছেড়েছে, বাপমায়ের প্রভাব এড়িয়ে একটা নতুন অনমনীয় পরিবেশে খোকাকে মানুষ করে তুলতে চেয়েছে।

দেখা যাক। শেষ চেষ্টার জ্বলন্ত অঙ্গার বন্দনা এবার ছুঁড়ে মারবে অখিলের লালসা-জর্জর মুখের ওপর। ভূমিকম্পের প্রবল আলোড়নে তার কাঁচা ভিতটা ফেটে চৌচির হয়ে যাক। তার সঞ্চয় ভীমরুলের হুলের মত তাকে যন্ত্রণা দিক। সমস্ত শরীর ফুলে উঠুক। বিষ দিয়েই বিষ নামাবে বন্দনা। মনের যত অলিগলি ভিজে অন্ধকারে সে থমকে-থমকে খুঁজে দেখে। না, আজ তার কোথাও লজ্জার কোন অস্পষ্ট রেখাও নেই। শুধু অন্ধ উদ্দাম, এক বোবা আক্রোশ।

লোকও আসে একের পর এক। যখন রাস্তায় লোক-চলাচল কমে যায়, কুয়াশা থমথম করে আর ভাল করে মানুষের মুখ চেনা যায় না, তখন দরজার কড়া নড়ে উঠে। ভীরু করুণ আবেদনের মত। ফ্যাকাশে চোখে বন্দনা তাকায় এদিক-ওদিক। অখিল তাড়াতাড়ি আসল আর সুদের হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। খট করে দরজা খোলে। সেই আওয়াজে মাথা ঘুরতে থাকে বন্দনার।

সে জানে এরপর কি হবে। গয়নার টুং-টুং আওয়াজ। বেশি টাকার জন্যে করুণ মিনতি। কিন্তু অখিলের এক কথা। কোন কান্নায় ওর মন গলবে না। আর একবার ভেতরে আসবে। আলমারি খুলে টাকা বের করে দেবে। খাতা খুলে আবার একটা নতুন পাতা ভরাবে। তারপর বন্দনার দিকে তাকিয়ে নির্লজ্জের মত হাসবে। সুদ দিতে পরপর দু-তিনবার মোটে আসে লোকগুলো। ব্যস, সেই শেষ। আর

আসে না। বন্ধক-দেওয়া গয়না অখিলের হয়ে যায়। সে-গয়না বাড়িতে রাখে না সে। বিক্রী করে টাকা ব্যাঙ্কে রাখে। খোকাকে ভাল করে মানুষ করবার জন্যে। আর বন্দনার সব অভাব দূর করবার জন্যে। এমনি করেই সংসারে সুধা ছড়িয়ে দিতে চায় অখিল।

কিন্তু একদিন প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত ঝলসে উঠল বন্দনার কথা। আর অখিলের দুই চোখ ভরে যেন মুঠোমুঠো ধুলিকণা ঝরে পড়ে। সেই শেষ। তারপর ভীরু আবেদনের মত আর একদিনও দরজার কড়া নড়ে উঠে নি। হিসেবের খাতায় নতুন আঁচড় পড়ে নি একটাও। সে-খাতাটা পুড়িয়ে ফেলেছে বন্দনা।

ভেবেছিল শুনবে না। কিন্তু বন্দনা হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে। সাবধানে পর্দা সরিয়ে একবার দেখে নেয় যে এসেছে তাকে। এক বউ। সরু-সরু হাত। কি আশ্চর্য রোগা—দেখলে ভয় লাগে। কথা বলতে বলতে হাঁপাচ্ছে। গায়ের শস্তা কালো চাদরটা হাত দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে বারবার। টেবিলের ওপরে কয়েকগাছা চুড়ি। অখিল দেখছে ওগুলো।

কত চান ?

কত পাব তা তো জানি না।

চুড়িগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে অখিল বলে, শ খানেক টাকা নিয়ে যান।

বিবর্ণ মুখে বউটি বলে, মোটে একশ টাকা !

আপনি অন্য কোথাও দেখুন না বরং—

না, না। আর কোথায় যাব ! আর যে একটুও সময় নেই। এতক্ষণে হয়ে গেছে কিনা জানি না—তবু একবার ডাক্তার নিয়ে যাব। সব জায়গায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি ভদ্রলোক তাই। দিন যা-হয়—

অখিল এ ঘরে আসে। চাবি ঘুরিয়ে আলমারি খোলে। রসিদ লেখবার জন্যে কাগজও নিয়ে যায়। বন্দনার সমস্ত দেহ থরথর করে

কাঁপছে। খোকা তেমনি করে কটে শুয়ে আছে। এখন অখিল তাকায় না কোনদিকে। বন্দনার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার কথা আন্দাজে বুঝে নেয়।

বউটি বেরিয়ে যেতে না যেতেই ও ঘর থেকে জ্বলন্ত আগুনের মত বন্দনা ছিটকে এ ঘরে আসে, চুড়ি ফিরিয়ে দাও। ওকে ডাক। একশ টাকা অমনি দাও—

বন্দনার চেহারা দেখে প্রথমটায় বিমূঢ় হয়ে যায় অখিল, অমনি দিলে ও নেবে কেন ?

নিক না নিক, তুমি ওকে ডাক। কি বিপদ ওর, একবার জিজ্ঞেস করবারও দরকার মনে করলে না তুমি ?

এতক্ষণে ও অন্ধকারে হারিয়ে গেছে বন্দনা। ওকে আর ডাকা যাবে না, চুড়িগুলো হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখে বন্দনার দিকে তাকিয়ে হাসে অখিল।

ডাকবে না ?

না, অখিল মাথা নাড়ে।

আগুনের আঁচে যেন কটকট করে বন্দনার চোখ, শোন—একটা কথা—যা আমি তোমাকে এতদিন লজ্জায় বলতে পারি নি—

কি ?

যার জন্যে তুমি এতবড় অমানুষ হয়ে উঠেছে সেই আমি আজ তোমাকে ঘৃণা করি।

জানি। কিন্তু তোমার ঘৃণা চিরকালের নয়—দুদিনের।

আর একটা কথা তুমি এখনও জান না—

বল ?

যে ছেলের জন্যে তুমি নিজেকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়েছ, এক সুরে বন্দনা বলে যায়, সে ছেলে তোমার নয়—

তবে কার ? একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসে অখিলের মুখ থেকে। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে বন্দনার দিকে।

ব্রজেনের—

বন্দনা! তাসের প্রাসাদ যেন এক মুহূর্তে ভেঙে পড়ে অখিলের চোখের সামনে। ধুলো, ধুলো আর ধুলো। এত ধুলো এই নিঃঝুম রাতে কোথা থেকে এল ঘরে। কিছু দেখতে পায় না অখিল খোকাকে নয়। বন্দনাকে নয়। নিজেকেও নয়। ধুলোর বিপুল ঝড়ে শীর্ণ কাকের মত কোথায় হারিয়ে যায়।

সারা রাত ঘুম নেই বন্দনার চোখে। অখিলকে ঠিক জায়গায় আঘাত করছে সে। মুখে কথা নেই ওর। ছটফট করছে বিছানায়। কত রাত ঘুমোতে পারবে না কে জানে। কে জানে হঠাৎ এক সময় বন্দনার গলা টিপে ধরবে কিনা। খোকাকে মেরে ফেলবে কিনা। নিজেকে নিজে শেষ করে দেবে কিনা। একটা থমথমে আতঙ্ক কাঁপে ঘরের চারপাশে সারা রাত ধরে।

হয়তো সকালবেলা অখিলের উগ্রমূর্তি দেখবে বন্দনা। তাদের তুজনকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাবার সময় একবারও পা কাঁপবে না বন্দনার। একবারও পিছন ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করবে না। সব গ্লানির বোঝা এখানে রেখে হালকা বুকে খোকার হাত ধরে সে চলে যাবে। কোন আকর্ষণ অনুভব করবে না অখিলের জন্যে।

ভোরের প্রথম আবছা আলো বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ে। বাইরে পাখি ডাকছে কিনা বোঝা যায় না। একটা আশ্চর্য নীরবতা। মশারি তুলে আস্তে আস্তে বাইরে আসে অখিল। খোকার কটের দিকে এগিয়ে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত চমকে ওঠে। হয়তো, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দনা বাধা দেবে অখিলকে।

খোকাকে কোলে তুলে নিয়ে অখিল মশারি তুলে বন্দনাকে দেখে। না ভয়ের কিছু নেই। লালসার ছায়াটাও মুছে গেছে তার মুখ থেকে। তার শান্ত চোখে আবার এক অলৌকিক জ্যোতি দেখতে

পায় বন্দনা। খাঁজ-কাটা হলদে ফুলদানির ওপাশে যেমন একদিন দেখেছিল—সেই সমর্পণের প্রথম দিন।

খোকাকে কোলে নিয়ে অখিল বন্দনাকে দেখে অনেকক্ষণ। আর হাসির দীপ্তি ঠিকরে পড়ে তার মুখের এপাশে-ওপাশে। কিন্তু এতদিন পর আবার বন্দনার লজ্জা যেন নতুন করে তাকে ঘিরে ধরে। ব্যাগ্র হাতে লেপ টেনে সে মুখ লুকোয়।

আলোর অনেক রেখা ঘরের মাঝখানে তখন এক হয়ে মিলছে

২৫শে নভেম্বর : ১৯৫৯

বুধবার সন্ধ্যা : কলিকাতা